বাতায়ন

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী

মূল্য বার আনা

প্রকাশক—

শ্রীহেমেন্দ্র নাথ দত্ত

সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা

১৮ই ফাল্গুন, ১৩১২ সাল।

ঢাকা,

ভারত-মহিলা প্রেসে,

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত

নিবেদন

১৩১৮—১৩২০ সাল এই তিন বৎসরকাল সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখিয়াছি, সেগুলি সম্প্রতি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। এজন্য আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রকাশকের নিকটে আমি কৃতজ্ঞ।

প্রথম দুইটি প্রবন্ধ—"শিল্প" ও "কবিতা"—বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ভূতপূর্ব্ব বয়স্ক ছাত্রদিগের সম্মিলনীতে পাঠ করিয়াছিলাম। সাহিত্য সম্বন্ধে ধারাবাহিক ক্রমে তাহাদিগের নিকটে বক্তৃতা দিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। দুইটির বেশি বক্তৃতা পাঠ হয় নাই। অন্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে প্রায় অনেকগুলি শান্তিনিকেতনের 'প্রবন্ধপাঠ সভায়' পড়িবার জন্য রচিত হইয়াছিল।

সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমি নিজে স্বাধীনভাবে যাহা চিন্তা করিয়াছি ও যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, এই প্রবন্ধাবলীর মধ্যে তাহাই যে নিবদ্ধ হইয়াছে, একথা যেন কোন পাঠক মনে না করেন। এ কালের ভাবজগতে এদেশে ও বিদেশে যে সকল আলোচনা নানা ধারায় প্রবাহিত হইতেছে, আমি আমার ক্ষুদ্র অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া তাহা হইতেই কতক কতক তীর্থোদক বহন করিয়া আনিয়াছি মাত্র। যেটুকু আনিতে পারিয়াছি, তাহা নিতান্তই যৎসামান্য। সুতরাং আমার এই প্রবন্ধগুলি যদি কাহাকেও একালের ভাবজগতে প্রবেশ করিতে সামান্যমাত্র সাহায্য করে, তাহা হইলেই আমার এ গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা হইবে।

পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমার এই গ্রন্থের নাম রাখিয়াছেন—বাতায়ন। এই নামকরণের জন্য আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ। বাতায়ন যেমন বিশ্বের আলোবাতাসকে ঘরের ভিতরে আনে, আমার এই গ্রন্থ যদি ভাবলোকের আলো-হাওয়াকে খুব সামান্য পরিমাণেও সংগ্রহ করিয়া আনিতে কৃতকার্য্য হইয়া থাকে, তাহা হইলেই এই নামকরণ সার্থক হইবে। পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবু আমার প্রবন্ধগুলিরও অধিকাংশই রচনাকালেই দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, সেজন্যও আমি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞ।

শ্রীঅজিতকুমার চক্রবর্ত্তী।

এই গ্রন্থ

আমার স্বর্গীয় পিতৃদেবের

শ্রীচরণে

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচী

বাতায়ন

শিল্প

বোধ হয় সৌন্দর্য্যতত্ত্ব লইয়া পণ্ডিতমহলে যত বাদানুবাদ হইয়াছে, এমন আর অন্য কোন তত্ত্ব লইয়া হয় নাই।

ইংরাজীতে একটা প্রবাদবাক্য আছে যে, যেখানে মূর্খতাই স্বর্গ, সেখানে বিজ্ঞ হইতে যাওয়াটাই নির্বুদ্ধিতা। লেসিং, হার্ডার, গায়টে, কাণ্ট, ফিক্টে, শেলিং, হেগেল, পেটার, রসেটি—বড় বড় সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদ্‌দিগের এই নামগুলি শ্রবণ করিয়াই সেই প্রবাদবচনটিকে আশ্রয় করিতে হয়। বাস্‌রে, এত লোকের মোটা মোটা আলোচনার পুঁথি শেষ করিয়া তবে সৌন্দর্য্য কি তাহা জানা যাইবে! না হয় না-ই জানিলাম!

এ কথা শুধু মূর্খেই বলে না। সৌন্দর্য্যতত্ত্বের সঙ্কলনকর্ত্তা হইয়া যাঁহারা খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহাদের ভারী ভারী গ্রন্থগুলি পড়িয়া সকলেরি মনে এই একই কথার উদয় হয়। সৌন্দর্য্যতত্ত্বশাস্ত্রে যেমন বিচিত্র এবং অনেক সময় পরস্পরবিরুদ্ধ অনুসন্ধান প্রণালী ও আলোচনার বৈচিত্র্য দৃষ্টি হয় এমন আর কোন তত্ত্বশাস্ত্রে হয় না।

সকলেই জানে যে কবি রবীন্দ্রনাথের 'পূর্ণিমা' বলিয়া একটা কবিতা আছে। কবি একদিন নিঃসঙ্গ প্রবাসে এক পূর্ণিমার সন্ধ্যায় একাকী বসিয়া সৌন্দর্য্যতত্ত্বের একটা ভারী গোচের গ্রন্থ পাঠ করিতে

ছিলেন ; অনেকক্ষণ পড়িতে পড়িতে তাঁহার মন এমনি পীড়িত হইল যে, তাঁহার মনে হইল সৌন্দর্য্য, কল্পনা এ সমস্তই মিথ্যা কথা। এই ভাবিয়া তিনি যেমনি প্রদীপ নিভাইয়া দিলেন, অমনি চারিদিক্ হইতে একটা পুলকিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্নার হাসি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল—তিনি ভাবিলেন, এ কি আশ্চর্য্য! একটিমাত্র প্রদীপের অন্তরালে সমস্ত বিশ্বব্যাপী সৌন্দর্য্য লুকানো ছিল—আর তাহাকেই তিনি খুঁজিয়া মরিতেছিলেন শুষ্ক পাতার অক্ষরের মধ্যে ?

"মুক্ত কর্ণপুটে
গ্রন্থ হতে গুটিকত বৃথা বাক্য উঠে
আচ্ছন্ন করিয়াছিল কেমনে না জানি
লোকলোকান্তরপূর্ণ তব মৌন বাণী!"

আমেরিকান্ কবি ওয়াল্ট হুইট্ম্যানের "তৃণদল" নামক কাব্যে একটি কবিতা আছে—The Base of All Metaphysics—সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রের ভিত্তি। কবি বলিতেছেন—"কান্ট, ফিক্টে, শেলিং, হেগেল সমস্ত পড়িয়া, প্লেটো এবং প্লেটোগুরু সক্রেটীস্ এবং সক্রেটিসের চেয়ে যিনি বড় সেই ভগবান্ খৃষ্টের সমস্ত বাণী ভাল করিয়া পাঠ করিয়া—আমি সক্রেটিস্, খৃষ্ট সকলেরি তলায় কেবল এই জিনিসটি দেখিতে পাইতেছি :—

"The dear love of man for his comrade, the
attraction of friend for friend
Of the wellmarried husband and wife, of
children and parents,
Of city for city, of land for land."

মানুষের নিজ সহচরের প্রতি অনুরাগ, বন্ধুতে বন্ধুতে প্রণয়, স্বামী স্ত্রীর প্রেম, সন্তান ও পিতামাতার ভালবাসা, নগরের জন্য নগরের, একদেশের জন্য অন্য দেশের টান—সমস্ত তত্ত্বশাস্ত্রের ভিত্তিতে ইহাই বিদ্যমান।

এই দুইটি কবিতারই ভিতরকার কথা এই যে, মানুষ কথাকে সত্যের চেয়ে অনেক বেশি আদর করিয়া থাকে, নিজের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ বস্তু হইতে অধিক বিশ্বাস করে। সৌন্দর্য্যতত্ত্বকে আবার কোন্ শাস্ত্রে অন্বেষণ করিব? দেখিতে পাওনা যে সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া সে শাস্ত্র লিখিত হইয়া আছে! সেই বিশ্বসৌন্দর্য্যশাস্ত্রের যে বাণী তাহা কি কতকগুলি নাম ও সংজ্ঞার ন্যায় শুষ্ক, প্রাণহীন বাণী? তাহা যে অকথিত বাণী—গ্রহে, চন্দ্রে, সূর্য্যে, আকাশে, বাতাসে, বনগিরিসমুদ্রে, মানবসমাজের সহস্র কর্ম্মকোলাহলে সেই গভীরগম্ভীর পরিপূর্ণ বাণী ডুবিয়া আছে—সেই বাণীরই নানান্ অক্ষর, এই রং, এই গন্ধ, এই স্পর্শ, এই ধ্বনির বিচিত্র স্পন্দনরাজি! এই অক্ষরের সঙ্গে অক্ষর মিলাইয়া সেই অনির্ব্বচনীয় গূঢ় বিশ্ববাণীকে বিশ্বশাস্ত্রে পাঠ করেন যে সৌভাগ্যবান্, তাঁহার ভাষাও এই পরমনিগূঢ় অনুচ্চারিত ভাষারই সমজাতীয় ইহা নিশ্চয়। তিনিইতো কবি, তিনিইতো শিল্পী। সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্য্যকে বাদ দিয়া ঘরে বসিয়া শুধু তত্ত্বের জালরচনা কখনই সত্য নহে—সে রচনার সঙ্গে বিশ্বরচনার সুর কখনই মেলে না।

এই জন্যই রস্কিন্ বলিয়াছেন যে, All great in art is praise—শিল্পের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। অর্থাৎ এই প্রত্যক্ষ বিশ্বসৌন্দর্য্য যে খুব ভাল লাগিয়াছে, সেই কথাটুকু জানাইবার জন্যই ছবি আঁকা, গান গাওয়া, কবিতা রচনা—সেই ক্ষণকালীন্ ভাললাগাকে সমস্ত

মানুষের মধ্যে, চিরকাল রাখিয়া দিয়া যাইতে পারিবে,—মহৎ শিল্পের এই একটিমাত্র আশা।

"তোমার বীণায় কত তার আছে
কতনা সুরে
আমি তারি সাথে আমার তারটি
দিবগো জুড়ে।"

এই যে অনন্ত নীলাম্বরপটে আলোছায়ার সুন্দর সমাবেশে কত বর্ণের কত বিচিত্র আকারের অসংখ্য চিত্ররাজি পৃথিবীমাতার এই বিপুল চিত্রশালায় শোভমান, মুগ্ধ নেত্রে কি তাহারি স্তবে ভরপুর হইয়া, তাহারি রং তাহারি রেখা ধার করিয়া ছবি আঁকিয়া, তাহারি পাশে চিত্রকর স্থান কামনা করে নাই? সমস্ত বিশ্বচরাচর যে ভাষাশূন্য 'মহাসামগান' করিতেছে—সপ্ত সমুদ্র উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের গর্জ্জনগানে আকাশকে মুখরিত করিতেছে, মহারণ্য প্রবল ঝটিকার মর্ম্মর-মন্দ্রে অপূর্ব্ব সঙ্গীতকে প্রকাশ করিতেছে—গায়ক কণ্ঠের অতি ক্ষীণ স্বরে কি সেই দিগ্‌দিগন্তধ্বনিত বিশ্বসামগানের স্তবে কত ভৈরবী মল্লার কত পূরবীখাম্বাজের সৃষ্টি করে নাই? সুতরাং মানুষের চিত্রে, সঙ্গীতে, কাব্যে—বিশ্বচিত্র, বিশ্বসঙ্গীত, বিশ্বকবিতার স্তব কেবলি নানারূপে ভরিয়া ভরিয়া উঠিতেছে।

কিন্তু রস্কিন্ শিল্পের ললাটে আর একটি বিশেষণ জুড়িয়া দিয়াছেন —গ্রেট অর্থাৎ মহৎ। তিনি বলিয়াছেন, শিল্পের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। ঐ বিশেষণের দ্বারা তিনি যে সকল শিল্প মানুষের প্রয়োজনে লাগে, তাহাদিগকে বাদ দিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, শিল্প সম্বন্ধে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের ভেদ-রেখা টানিবার আবশ্যকতা নাই। প্রয়োজনের জন্যও যে শিল্পদ্রব্য সৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যেও এই স্তব আছে। কারণ তাহা প্রয়োজনের নিক্তির মাপেই

যে তৈরি হয় তাহা নহে, তাহার মধ্যে বাহুল্য ভাগই অনেক সময় বেশি দেখা যায়। লজ্জা নিবারণের জন্য যেটুকু বস্ত্র মানুষের প্রয়োজন, তাহা যেমন তেমন একটুখানি মোটা গোচের চীর হইলেই হইত, অন্নপান যে কোন রকম পাত্রে হইতে পারিত,—কিন্তু সেই বস্ত্রে, সেই থালা ঘটিবাটীতে মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ যে কত কারু-কার্য্যই ফলাইয়াছে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে কে বলিবে তাহার মধ্যে কোন স্তব নাই? তবে সে স্তব অজ্ঞাত স্তব—মানুষ জানেও না যে, সে তাহার প্রয়োজন মিটাইবার জিনিসটাকেও এমন করিয়া গড়িয়াছে যাহাতে তাহা প্রয়োজনের সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। কোন কোন বিষয়ে হয়ত প্রয়োজনকে ব্যাহত করিয়াছে বা!

আদিম অসভ্যযুগের অরণ্যচারী মানুষের প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দি। যখন হইতে মানুষ অগ্নিকে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে, কুম্ভকারের কুলালে বিচিত্র কুম্ভের সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন সেই সকল অসভ্য যুগের কুম্ভ,—পুষ্পপল্লবের রেখার-আকারের, জল-লহরীর সুন্দর ভঙ্গিমার, হস্তপুটের আশ্চর্য্য নিবেদনের বিমুগ্ধ স্তবের একটি পুষ্পাঞ্জলি কি পূর্ণ করিয়া দেয় নাই?

তন্তুবায়ের তন্ত্রটিও মানুষের কোন্ আদিম কালের জিনিস তাহা কে জানে? সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যে শ্যামহরিৎ বসনখানি পরিয়া আছে, নিশ্চয় তাহারি সৌন্দর্য্যমুগ্ধতা হইতে সূক্ষ্ম বসন বয়নের উৎপত্তি! মানবশরীর কি প্রকৃতির চেয়ে কম সুন্দর—বরং অনেক বেশি সুন্দর, কারণ প্রকৃতির মধ্যে যাহা বিচিত্র হইয়া ছড়াইয়া আছে, সুন্দর মানব-শরীরে তাহাই যে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে—সেই জন্যইতো কবিরা সুন্দর শরীরের উপমা সর্ব্বত্র খুঁজিয়া মরেন? সেই শরীরের অপরূপ লাবণ্যকে বিকশিত করিয়া তুলিবে যে বসন, তাহার রূপ কি যেমন

তেমন হইতে পারে? তাই সেই বসনের কত সূক্ষ্ম বুনানি, পাড়ে কত রংয়ের খেলা, পরিধানের কত রকমের বিন্যাস! প্রশান্ত সমুদ্রদ্বীপবাসী বর্ব্বরগণ নারিকেলপত্রদ্বারা যে মাদুর বানায়, পাখা তৈরি করে, ঝুড়ি বোনে, তাহার কারুকার্য্য দেখিয়া অনেক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ঘাসের যে সবুজ মাদুর প্রকৃতি দেবী স্বয়ং বিস্তীর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, পত্রের যে বীজন নিয়তই চলিতেছে, লতাজালে যে সুন্দর চুপ্‌ড়ি বনলক্ষ্মিগণ স্বহস্তে বয়ন করেন, বর্ব্বরহস্ত-রচিত সে সমস্ত মাদুর, পাখা, ও চুপ্‌ড়ি কি না জানিয়া তাহাদেরি স্তব করে নাই? সুতরাং প্রয়োজনের শিল্পই বলি, বা অপ্রয়োজনেরই বলি, শিল্পমাত্রেই একটি অজ্ঞাত স্তব আছে—সে বলিতেছে, বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে! নিতান্ত প্রয়োজনের দ্রব্যেও সেই ভাললাগা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে—নিতান্ত অসভ্য জাতির ব্যবহারের শিল্পেও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

আশা করি রস্কিনের এই সংজ্ঞার অর্থটি পরিষ্কার হইয়াছে। ইহা খুব চমৎকার, কিন্তু তথাপি ইহার একটি দোষ আছে। ইহাতে হঠাৎ এই ধারণা হওয়া অসম্ভব নয় যে, তবে বুঝি শিল্প কেবল প্রকৃতির অনুকরণ, প্রকৃতির ফটোগ্রাফ মাত্র। শিল্প কি অনুকরণের চেয়ে বড় নয়, তাহা কি স্বাধীন সৃষ্টি নয়?

যেমন ধর, যখন কোন চিত্রকর প্রকৃতির কোন সুন্দর দৃশ্যের ছবি আঁকিতেছে, তখন সে কি যেমনটি দেখিতেছে, তেমনটিই যথাযথভাবে আঁকিয়া যাইবে? তবে না আঁকিলেই হইত, এত মেহন্নত করিয়া আঁকিবার প্রয়োজন কি ছিল? কিন্তু কোন ভাল চিত্রকরই নকল করিয়া আঁকে না। তাহার কারণ, সে যে দৃশ্যটি আঁকিতেছে, তাহা তো শুধু চোখে-দেখা দৃশ্য নয়, তাহা তাহার মনের কল্পনার মধ্যে

যে ভাবে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই দৃশ্যটি সেই ভাবরাগরঞ্জিত দৃশ্য। সুতরাং প্রকৃতিতে যে রাগ আছে, তাহার সঙ্গে হৃদয়ের রাগটিকে মিলাইয়া চিত্রকরকে ছবি আঁকিতে হইতেছে। সে ছবি কেমন করিয়া প্রকৃতির ফটোগ্রাফ হইবে?

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে কেবল বাহিরের দৃশ্যমান সৌন্দর্য্যের উপরে কল্পনা ও অনুভবের রঞ্জন মিশাইলেই কি সৃজন হইল? কাপড় বুনিল তন্তুবায়, আমি তাহাতে রং দিয়াছি বলিয়াই কি কাপড় আমি তৈরি করিয়াছি বলিতে পারি? সে তো যাহা আছে, তাহারি উপরে খানিকটা কারিকুরি করা মাত্র। সৃজন তাহাকে বলি কেমন করিয়া?

মনে হয়, এত স্পর্দ্ধা কাহার যে ভগবানের সৃষ্টির উপরেও নূতন করিয়া কিছু সৃষ্টি করিবার দাবী রাখিবে? তাঁর এই সৌন্দর্য্যময় বিশ্বসৃষ্টি আমাদের চিত্তের ভিতরে আসিয়া রং ধরিতেছে, সেই কল্পনার রঙে অনুভূতির রঙে রাঙিয়া তাহাকেই পুনরায় আমরা শিল্পে ব্যক্ত করিতেছি—মাছের তেলেই মাছ ভাজিতেছি—নূতন সৃষ্টি করিবার কথা কোন্ দুঃসাহসী মুখে উচ্চারণ করিবে?

তবু বিশ্বপ্রকৃতির উপর শিল্প এক জায়গায় জিতিয়া আছে। সম্পূর্ণতার যেটি তত্ত্ব, ইংরাজীতে যাহাকে বলে Ideal, তাহা বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে কোথাও নাই, সে তত্ত্বটি আছে কেবল মানুষের অন্তরে। তাহার কারণ, বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতিতে সমস্তই চঞ্চল, সমস্তই অস্থির—সেখানে যে পরিবর্ত্তনই নিয়ম—সকল বস্তুরই অহরহ রূপান্তর ঘটিতেছে। তাহা ছাড়া সমস্তই সেখানে অপূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া পূর্ণতর অবস্থার দিকে চলিয়াছে বলিয়া—অর্থাৎ অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া—পূর্ণতাকে একেবারে কোথাও পাইবার জো নাই।

"কাছে যাই যার, দেখিতে দেখিতে
চ'লে যায় সেই দূরে—
হাতে পাই যারে পলক ফেলিতে
তারে ছুঁয়ে যাই ঘুরে।"

সুতরাং বাহিরে যেখানে সকল জিনিসই পরিবর্ত্তনের মুখে, যেখানে শেষ পরিণাম কোথাও নাই, সেখানে পূর্ণতার আদর্শকে অন্বেষণ করাই বিড়ম্বনা।

সেই কারণে দেখা যায় যে, যে জ্ঞানী বাহিরের বিষয়রাজ্যে পূর্ণতার তত্ত্বকে খোঁজেন, তাঁহাকে অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয় যে, পূর্ণতা কোথাও নাই, সমস্তই কেবল অন্তহীন প্রবাহের মধ্যে আবর্ত্তিত পরিবর্ত্তিত হইতে হইতে চলিয়াছে। অসংহত বাষ্পপিণ্ড কোন্ আদিমকালে সংহত গ্রহের আকার লাভ করিয়াছিল, সেই পৃথিবী-গ্রহ ক্রমে ক্রমে আপনার উত্তাপ বিকীরণ করিতে করিতে শৈত্য লাভ করিল, ক্রমে বাষ্প জমাট্ বাঁধিয়া বাঁধিয়া ধারাবর্ষণে সমস্ত পৃথিবীকে জলময় করিয়া দিল, ক্রমে কখন্ সেই অকূল দিগ্‌দিগন্তব্যাপী সমুদ্র হইতে দানাবাধা স্থলসমূহ জাগ্রত হইয়া উঠিল, সেই আদিম অরণ্য এবং মহাকায় ম্যামথ ম্যাষ্টোডন্ প্রভৃতি জন্তুর সেই প্রথম জীবনযাত্রা,—তারপর কত তুষারাস্রোত, কত পর্ব্বতোচ্ছ্বাস, স্তরে স্তরে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে কত জীবধারা এই পৃথিবীর মাটীর উপরে লীলা করিয়া মাটিতেই মিশাইল—শেষে মানুষ হিংস্রজন্তুরাজ্যের মধ্যে নগ্ন অসহায়ভাবে একদা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পর হইতে কত নব নব বিকাশের পথে তাহার ইতিহাস অভিব্যক্ত হইয়া চলিল—কত জাতি জাগিল এবং কত জাতি বিলুপ্ত হইল এবং এখনও সমস্ত মানুষ যে কত বিচিত্রতার মধ্য দিয়া যাইবে তাহা কে জানে!

সুতরাং বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে সম্পূর্ণতা কোথাও নাই, সম্পূর্ণতা কথাটা আপেক্ষিক কথামাত্র। এই অবস্থার চেয়ে এই অবস্থা পূর্ণতর, এইটুকুমাত্র জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে বলা চলে।

আমি এ প্রসঙ্গ লইয়া বেশি আলোচনা করিতে গেলে অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হইবে। কেবল এইটুকুমাত্র কথা আমাকে বলিতে হয় যে সম্পূর্ণতার আদর্শ যদি আমাদের ভিতরে না থাকে, তবে বাহিরে যে আপেক্ষিক সম্পূর্ণতা দেখিতেছি অর্থাৎ অমুক অবস্থার চেয়ে অমুক অবস্থা সম্পূর্ণতর দেখিতেছি, তাহাও দেখা সম্ভবপর হইত না। আইডিয়ারূপে সম্পূর্ণতার একটি তত্ত্ব আমাদের মনের মধ্যে নিশ্চয়ই বিরাজ করিতেছে।

সুতরাং শিল্প প্রকৃতির চেয়ে এই একটি বিষয়ে জিতিয়া আছে যে, শিল্পের মধ্যে সেই সম্পূর্ণতার তত্ত্বটি আমরা দেখিতে পাই—আদর্শকে দেখিতে পাই। অর্থাৎ পূর্ব্বে যে আমি বলিয়াছি যে, আমরা যখন প্রাকৃতিক কোন দৃশ্যের ছবি আঁকি, তখন আতপ-চিত্রের (ফোটো) মত করিয়া আঁকি না, তাহাতে ভাবের রং মিশাই—তার মানে এই যে, যে দৃশ্যটি চোখে দেখি তার চেয়ে সুন্দরতর দৃশ্যের আভাস দি। কিন্তু সেই সুন্দরতর দৃশ্যের আভাস পাই কোথায়? নিশ্চয় আমার মনের মধ্যে, কারণ বাহিরে তাহাতো কোথাও নাই। তেমনি যখন মানুষের ছবি আঁকি, তখনও চোখে-দেখা মানুষের বাহ্য চেহারাটাকেই যথাযথরূপে আঁকি না, কিন্তু যে ভিতরের অদৃশ্য মানুটিষকে দেখি নাই, যে মানুষটির কোন রূপ বাহির হইতে দেখিবার জো নাই, সেই সম্পূর্ণতর মানুষকেই আঁকি।

মনে আছে চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কোন রচনায় পড়িয়া থাকিব যে, যদি তাঁহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছবি

আঁকিতে হয়, তবে তিনি বিদ্যাসাগরের যে প্রতিমূর্ত্তি আছে তাহারই নকল করিবেন না, কিন্তু বিদ্যাসাগরের অজেয় পৌরুষের ও নানা মহত্ত্বের যে একটি পূর্ণ আদর্শ আমাদের মনে বিরাজ করিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা করিবেন। গান্ধারশিল্পে গ্রীক্‌গণ বুদ্ধের তপোমূর্ত্তি গড়িতে গিয়া অস্থিপঞ্জর বাহির করা কঙ্কালসার এক মূর্ত্তি গড়িয়াছিল, লাহোর মিউজিয়মে আজিও তাহা দেখা যায়। কিন্তু সেই মূর্ত্তিই কি যথার্থ বুদ্ধের মূর্ত্তি? কঠোর তপস্যার পর বুদ্ধের বাহিরের চেহারাটা হয়ত ঐরূপ কৃশ ও জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে তো বাহিরের চেহারা—প্রবুদ্ধত্বের শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিটি কোথায়? আমাদের দেশে শিল্পীরা সেই মূর্ত্তিই গড়িয়াছে—বাহিরের চেহারার সম্বন্ধে লেশমাত্র চিন্তা করে নাই।

যেমন চিত্রকলায়, তেম্‌নি সঙ্গীতে, তেম্‌নি কবিতায়—সম্পূর্ণতার আদর্শকেই আমরা দেখিতে চাই। এইজন্য সঙ্গীতে দুটি ভাগ আছে, তান এবং সম। তান ব্যাপ্তি, সম সমাপ্তি—তানে মূর্চ্ছনায় মূর্চ্ছনায় লহরে লহরে সুরকে একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া, কিন্তু তাহার সমস্ত বিচিত্রতাকে ক্ষণে ক্ষণে সমে পৌঁছাইয়া দিতেই হইবে—না দিলে সঙ্গীতের সম্পূর্ণতা নাই। ঠিক্ সেই একই জিনিস কাব্যেও দেখা যায়। যে কোন ভাবকে রূপ দান কাব্যের একমাত্র কর্ম্ম নহে, কিন্তু যে রূপটি দেওয়া যাইতেছে তাহা যে বস্তুগত স্থায়ী রূপ এই একটি স্থির নিশ্চয়তা থাকা চাই। যেমন কীট্‌সের Grecian urn—গ্রীক্ মৃৎপাত্রের উপর কবিতাটি। গ্রীক্ মৃৎপাত্রটির গায়ে একটি যজ্ঞোৎসবের ছবি আঁকা ছিল—বনের মধ্যে যুবক যুবতী বালবৃদ্ধ সকলে সমাগত হইয়াছে, কেহ বাঁশী বাজাইতেছে, কেহ প্রণয়গুঞ্জন করিতেছে, পুরোহিত যজ্ঞবেদিকার কাছে মাল্যমণ্ডিত গোবৎসটিকে

লইয়া চলিয়াছে—কোন্ সেই সুদূর অতীতকালের কোন্ একটি বিস্মৃত দিনের ছবি! কিন্তু কবি বলিতেছেন যে সে ছবি অনন্তের মধ্যে অমর হইয়া রহিল—কারণ সৌন্দর্য্যের মৃত্যু নাই। সৌন্দর্য্যই যে সত্য এবং সত্যই যে সৌন্দর্য্য—এই কথাটি সে বিচিত্র মৃৎপাত্রটি চিরন্তন কাল ধরিয়া জানাইবে। তার মানে ঐ কবিতাটিতে কীট্স্ ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের একটি মৃত্যুহীন অনন্ত স্থিতির ভাব অনুভব করিয়াছেন—এই সত্যটির জন্য তাঁহার সৌন্দর্য্যকল্পনা বস্তুগত রূপ পাইয়াছে। ক্ষণিকের মধ্যে চিরন্তনকে কীট্স্ যদি তাঁর কাব্যে না দেখিতেন, তবে তিনি যে সৌন্দর্য্যই সৃষ্টি করিতেন তাহা ছায়া হইয়া যাইত, তাহা বস্তুগত হইত না।

আমাকেও এবার তান ছাড়িয়া সমের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতে হয়—শিল্পতত্ত্বের একটা মীমাংসায় গিয়া পৌঁছিতে হয়। প্রথমে আমরা দেখিলাম যে শিল্পমাত্রেই বিশ্বসৌন্দর্য্যের স্তব, তার পরে দেখিলাম যে তাহাতে শিল্প অনুকরণ হইয়া পড়ে, সৃজন হয় না, এমন আশঙ্কা জাগে—সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতিতেও মানুষের হৃদয়ে এই উভয়ে মিলিয়া শিল্পের সৃষ্টি হয়, এই কথা বলা গেল। কিন্তু তাহাও কেমন জোড়াতালির মত শোনায় বলিয়া শেষে দেখিলাম যে শিল্পের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতার আদর্শ আছে, তাহাতে তাহা বাহিরের কেবল চোখে-দেখা মনে-অনুভব-করা অসম্পূর্ণ জিনিসকে সম্পূর্ণ সুন্দরতর করিয়া প্রকাশ করে। এককথায় শিল্প সুন্দরকে সত্য করিয়া তোলে।

একটু প্রণিধান করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই যে দুই রকমের মত যাহাকে ইংরাজীতে বলে Realism ও Idealism অর্থাৎ শিল্পকে বাস্তববিশ্বছবির প্রতিচ্ছবি করিয়া দেখা, এবং শিল্পকে অন্তরের

সম্পূর্ণতার আদর্শের বাহ্যপ্রকাশ করিয়া দেখা—এই দুই মতই এক একদিক্‌ঘেঁষা মত। কারণ,

ভীতর কঁহু তো জগময় লাজৈ
বাহর কঁহু তো ঝুটালো—

যদি বলি যে ভিতরই সত্য, তবে সমস্ত জগৎ যে লজ্জিত হয়, যদি বলি বাহিরই সত্য, তবে যে মিথ্যা হয়। সুতরাং বাহির এবং ভিতর এই দুয়ের সমান সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া শিল্পের উদ্দেশ্য ও সৃষ্টির বিচার করার প্রয়োজন। সেই কার্য্যে এখন প্রবৃত্ত হওয়া যাক্‌।

কিছু পূর্ব্বে আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে, বাহিরের জগৎটা পরিবর্ত্তনের জগৎ, বিকাশের জগৎ—সুতরাং এক হিসাবে তাহার কোন বাস্তবিক সত্তা নাই। তাহা কোথাও স্থির হইয়া নাই বলিয়াই আমরাও তাহাকে কোথাও পুরাপুরি ধরিতে পাই না; তাহার যে অংশটুকু আমাদের চেতনাকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে স্পর্শ করে আমরা তাহাকেই জানি। সেই জন্যইতো এক সময়ে এই পরিবর্ত্তমান জগৎটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি বাস্তবিক সত্তা বাহিরে নাই একথা যদি বলি, তবে বাহিরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার এমন একটি চিরন্তন দ্বৈতকে খাড়া করা হয়, যে মানুষের আত্মার আর কোন প্রকাশই থাকে না। শরীর নাই শরীরী আছে, রূপ নাই ভাব আছে, বাক্য নাই অর্থ আছে, ছায়া নাই আলো আছে—এমনি একটা অদ্ভুত কাণ্ড তখন হইয়া উঠে। বাস্তবিক সত্তাকে আমরা সেইজন্য সর্ব্বত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হই। তাহা ভিতরেও যেমন, বাহিরেও তেমনি—সমস্ত পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে তাহা অচঞ্চল হইয়া অবস্থান করিতেছে—সকল গতি তাহার অনন্ত স্থিতির দ্বারা অধিকৃত—এই কথাকে মানিতে আমরা বাধ্য হই।

কিন্তু এই যাহাকে বাস্তবিক সত্তা বলি, তাহাকে কি আমরা পাই? যদি মাঝে কোন আবরণ না থাকিত, বাস্তবিক সত্তার সঙ্গে আমাদের চেতনার যোগ যদি অব্যবহিত হইত, তবে আর আমাদের শিল্পসৃষ্টির প্রয়োজনই হইত না। কেন? না তখন, কিছুই তো আর খণ্ডিত করিয়া জানিতাম না,—আমাদের দৃষ্টি শ্রুতি সমস্তই সর্ব্বত্রই অখণ্ডতাকে পরিপূর্ণতাকে লাভ করিয়া ধন্য হইয়া যাইত। কিন্তু সে অখণ্ড দৃষ্টি আমাদের নাই, সে কথা বলাই বাহুল্য।

✓ ফরাসী মনীষী আঁরি ব্যার্গস্ঁ সেইজন্য শিল্প সম্বন্ধে তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, যে মানুষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বাস্তবিক সত্তাকে দেখিতে পায় না বলিয়া সব জিনিসকেই মোটেমাটে দেখে, শ্রেণীর মধ্যে ফেলিয়া দেখে। প্রত্যেকটি বস্তু যে অন্য যে কোন বস্তু হইতে অনেকগুণে স্বতন্ত্র—সেইস্বাতন্ত্র্যের কোন স্বাদ কোন পরিচয় মানুষ পায় না। আমরা বস্তুমাত্রকে দেখি না, তাহার উপর যে ল্যাবেল মারা থাকে তাহা দ্বারাই আমরা তাহাকে জানি। শুধু যে বাহিরের বস্তু সম্বন্ধেই এই মোটেমাটে অত্যন্ত সাধারণ করিয়া দেখার অভ্যাস আমাদের হইতেছে তাহা নহে, ভিতরেও আমরা যখন যে অভিজ্ঞতাই লাভ করি না কেন, আমরা সে অভিজ্ঞতার যে একটি বিশেষ রস আছে তাহা বুঝিতেই পারি না, তাহাকেও কোন না কোন গড্ডালিকার মধ্যে ফেলিতে পারিলে আমরা বাঁচি। ব্যক্তির মধ্যেই তাহার ব্যক্তিত্ব জিনিসটাই এইরূপে চোখ এড়াইয়া যায়। আমাদের সমস্ত সংস্কারই সাধারণ, অত্যন্ত অভ্যস্ত—আমরা যেমন প্রকৃত বাস্তবের বাহিরে, তেমনি আমাদের ব্যক্তিত্বের, নিজত্বেরও বাহিরে পড়িয়া আছি। কিন্তু সময়ে সময়ে প্রকৃতি এক এক জনকে এই জীবনের মোটা অত্যন্ত সাধারণ ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন—এক এক জন মানুষ

স্বাভাবিক এমন দৃষ্টিশক্তি লইয়া আসে, যাহাতে তাহার কাছে এই সকল স্থূল সংস্কারের আবরণ একেবারে টেঁকে না।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্যার্গসঁ Realism, Idealism, কোনটাকেই প্রাধান্য দেন নাই। তিনি বলেন নাই যে কেবল অন্তরের আদর্শের দিক্ হইতেই শিল্পের সৃষ্টি সম্ভবপর হয়। তিনি বরং বলিতেছেন যে চিত্রে, স্থাপত্যে, সঙ্গীতে, কাব্যে শিল্পের উদ্দেশ্যই ঐ শ্রেণীর মধ্যে মোটমাটের মধ্যে সাধারণের মধ্যে কিছু না জড়াইয়া রাখিয়া একবারে প্রত্যেক বস্তুর অন্তর্নিহিত বাস্তবসত্তাকে অনাবৃত করিয়া প্রকাশ করা। সুতরাং আমরা অন্তরের দিক্ দিয়া যে একটি সম্পূর্ণতার ভাব পাই বাহিরের প্রকৃতির উপর তাহাকে চাপাইলে যে শিল্পের সার্থকতা হয় তাহা নহে। বাহিরের উপরকার সংস্কারের স্থূল আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহার চিরনূতন অখণ্ড সত্তাকে উদ্ঘাটিত করিতে পারিলেই শিল্পের সার্থকতা।

ব্যার্গসঁর এই ব্যাখ্যাটি অতি চমৎকার। শিল্প সম্বন্ধে এমন পরিষ্কার আলোচনা অল্পই দেখিয়াছি। আমরা প্রত্যেক জিনিসকেই নানা সম্বন্ধের মধ্যে জড়াইয়া দেখি—সেই সকল সম্বন্ধের জটিল জটগুলা খুলিয়া যদি তাহাকে তাহার যথার্থ স্বরূপে দেখিতে পারিতাম, তবে সে কি আশ্চর্য্য সুন্দর বলিয়া এক নিমেষেই প্রতিভাত হইত। রবীন্দ্রনাথের "উর্ব্বশী" কবিতায় নারীকে সেই সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা হইয়াছে—তাহার চিরন্তন সৌন্দর্য্যে দেখা হইয়াছে। "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী!" একই সময়ে অনেক বস্তুকে সব মন দিয়া সব ইন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করা যায় না—শিল্পকে সেইজন্য তাহার বিষয়কে স্বতন্ত্র করিয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া একান্ত করিয়া লইতেই হয়।

তোমরা আমার কাছে সাহিত্য, বিশেষতঃ ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ। আমার মনে হয় যে সৌন্দর্য্যের বিষয় বল, প্রেমের বিষয় বল—সকল জিনিষকেই এই একান্ত, স্বতন্ত্র, অখণ্ড করিয়া দেখাই সেখানকার সাহিত্যের প্রধান বিশেষত্ব। সেখানে সর্ব্বত্রই প্রবল হৃদয়াবেগকে কোন বিশেষ একটী-মাত্র ক্ষেত্রে একান্ত করিয়া দেখিয়াছে—যেন পৃথিবীর মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে বড় জিনিষ! শেক্‌সপীয়রের নাটকের মধ্যে মানব হৃদয়াবেগের কি প্রচণ্ড প্রবল সংঘাত দেখা যায়—হ্যামলেট, লীয়র ওথেলো, ম্যাক্‌বেথ প্রভৃতিতে দ্বিধা, ক্রোধ, সন্দেহ ও উচ্চাভিলাষ কি ঘুর্ণার সৃষ্টি করিয়াছে! "উত্তপ্ত পৃথিবী ঠাণ্ডা হইয়া গেলেও যেমন আগ্নেয় উচ্ছ্বাসে মধ্যে মধ্যে ভিতরের সঞ্চিত উত্তাপ একেকবার আপনাকে জানান দেয়." সেইরূ নানাসংস্কারের বন্ধন, সমাজের বন্ধন মানুষের ভিতরকার প্রবল আবেগগুলিকে চাপাচুপি দিয়া রাখিলেও এক এক সময় সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ঝড়ের মত তাহারা গর্জ্জিতে থাকে—তখন তাহাদিগকে প্রশমিত করিবে এমন সাধ্য কাহার আছে? শেক্‌সপীয়রের সৃষ্ট চরিত্রদিগকে যে মানুষ আদর করিয়া আসিয়াছে তাহার কারণ এই যে, সেই সকল চরিত্রের মধ্যে মানুষ আপনারই একটী গভীরতর গোপনতর সত্তাকে আবিষ্কার করিয়াছে। যে সকল আবেগকে আমরা চাপাদিয়া দিব্য গতানুগতিক (conventional) ভাবে বলি, তাহারা যে কত বড়, তাঁহাদের শক্তি যে কি ভয়ঙ্কর—তাহা মানুষ ঐ সকল নাটকে স্পষ্ট চোখে দেখিয়াছে।

শেক্‌সপীয়র হইতে আরম্ভ করিয়া রবর্ট ব্রাউনিং পর্য্যন্ত সকল কবিরই মধ্যে এই বিশেষ বিশেষ আবেগের ঘূর্ণিপাক রচনার প্রয়াস দেখিতে পাই। বার্গস যে প্রত্যেক বস্তুকে অত্যন্ত একান্ত করিয়া

স্বতন্ত্র করিয়া দেখাই আর্টের চরম উদ্দেশ্য বলিয়াছেন—ইউরোপীয় প্রায় কবিরই মধ্যে সে কথার সাক্ষ্য মিলে। কিন্তু সেই জন্যই এই ঐকান্তিকতাকে বড় বলিয়া মানিতে ইতস্ততঃ বোধ করিতে হয়। কোন জিনিষকে তাহার আনুষঙ্গিক সমস্ত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন না করিলে যদি তাহা শিল্পের বিষয় না হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে মানুষের সৃষ্টির মধ্যেই একটা দুর্ব্বলতা আছে—তাহা স্বতন্ত্র করিয়া এবং মিলিত করিয়া, ব্যষ্টিগত করিয়া এবং সমষ্টিগত করিয়া এই দুই ভাবে একই সময়ে কোন জিনিষকে দেখিতে অক্ষম। বিশ্বপ্রকৃতিতে একখণ্ড তৃণও বলে—আমাকে দেখ—এবং সত্যসত্যই তাহার রহস্য অনুধাবন করিয়া একজন মানুষ জীবন কাটাইয়া দিতে পারে, কিন্তু সেই তৃণের সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন চিত্রইতো বাদ পড়ে না—তৃণই যে বিশ্বের মধ্যে সব হইয়া বসে তাহাতো হয় না। কিন্তু মানুষের শিল্পসাহিত্যেই কেন এ ব্যাপার ঘটে যে সে একটা আবেগকে চিত্রিত করিতে গেলে তাহা এমন প্রবল, এমন একান্ত হইয়া উঠে, যে মনে হয় যেন আর কোথাও কিছু নাই?

এই কারণেই আমাদের দেশ হইতে এই কথাটা ওঠা দরকার হইয়াছে যে, শিল্প ও সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য এই যে তাহারা ভিতরকার পরিপূর্ণতার আদর্শের দ্বারা বাহিরের সমস্ত আবরণ ভেদ করিয়া সকল জিনিষের অন্তরতম সত্তাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইবে—কিন্তু সে সত্তা স্বতন্ত্র হইবে না। তাহা একই কালে স্বতন্ত্র এবং মিলিত, সীম এবং অসীম হইবে। এবং এই সঙ্গে এই কথাও আমাদিগকে বলিতে হইবে যে মানুষের শিল্পসাহিত্য যে সে উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে আজিও সার্থক করিয়াছে তাহা নহে।

একথা কেন বলিতেছি? না,—শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রটা কত বড়

তাহা চিন্তা করিয়া দেখ—তাহা সমস্ত মানুষ, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি! কিন্তু সেই বৃহৎ ক্ষেত্রে কি শিল্পসাহিত্য বিচরণ করিতেছে? মানুষের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, চরিত্র, বুদ্ধি, হৃদয়—সকল দিকের সঙ্গে কি ইহার মিলন অবারিত হইয়া গিয়াছে?

অথচ বড় শিল্পসাহিত্যের মধ্যে এই একটি বড় প্রসারই আমরা লাভ করি—সেই জন্যই এককালে নয়, কিন্তু সর্ব্বকালেই—একজাতির মধ্যে নয়, কিন্তু সকল জাতির মধ্যেই তাহারা আদৃত হইয়া থাকে। বিশ্বপ্রকৃতি যেমন বিচিত্র অথচ অখণ্ড, বড় শিল্পের মধ্যে বড় সাহিত্যের মধ্যে সেইরূপ একটি সরল ঔদার্য্য ও সমগ্রতার আনন্দ বিদ্যমান থাকে। যেমন ধর সিংহল হইতে আনীত বুদ্ধের যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিলে মনে হয়, এই? এই বই নয়? আমি ভাবিয়াছিলাম বুঝি কত আশ্চর্য্যই বা হইবে! তার মানে তাহা আকাশ বাতাসেরই মত সহজ সরল ও গভীর, তাহার মধ্যে কোন কলাচাতুর্য্য নাই। বুদ্ধদেবের বাণী যেমন সরল অথচ যুগযুগান্তরতৃপ্তিবহ, বুদ্ধদেবের এই সকল মূর্ত্তিও সেইরূপ!

যেমন শিল্পে তেমনি বড় কাব্যে। যে কাব্যে আমরা মানব-জীবনের প্রসার সকলের চেয়ে বেশি করিয়া অনুভব করি, সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির আনন্দ যে কাব্যে ঝঙ্কার তোলে, মানবহৃদয়সভায় সেই কাব্য চিরন্তন আসন গ্রহণ করে। বাল্মীকির রামায়ণ, হোমারের ইলিয়াড্, কালিদাসের মেঘদূত, কীট্‌সের কবিতা, সেক্‌স্‌পীয়রের নাটক—এই রূপ কাব্য—তাহা দেশকালের সঙ্কীর্ণ বাধাকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

আমি 'পূর্ণিমা' কবিতার কথা দিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করিয়াছি। অথচ পূর্ণিমাকেই এতক্ষণ আমার এই বাদানুবাদ আড়াল করিয়া

রাখিয়াছে। অর্থাৎ যে চিরপূর্ণিমা চিরকাল মানুষকে ছবি আঁকাইয়াছে, গান গাওয়াইয়াছে, কবিতা লিখাইয়াছে তাহার কথাই আমি কম করিয়া বলিয়াছি। সে চিরপূর্ণিমা কোথায়—সে এই চিরসুন্দর বিশ্বপ্রকৃতি।

আমি বলিয়াছি যে ছোট বড় সকল বিষয়ে মানুষকে এই বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য উৎসব-সভায় বসাইয়া সঙ্কীর্ণতামাত্রের প্রাচীর ধূলিসাৎ করিয়া শিল্প এখনও ফেলে নাই। আধুনিক যুগে শিল্পের নিকট হইতে মানুষ সেই বড় প্রত্যাশাটি করিয়াছিল। কারণ আধুনিক যুগ সমস্ত মানুষকে সকল ক্ষেত্রে আহ্বান করিবার বড় যুগ। এখন প্রতিরাত্রেই থিয়েটার হইতেছে, গীতশালায় গান চলিতেছে, চিত্রপ্রদর্শনীতে নানা চিত্র ও মূর্ত্তি সকল প্রদর্শিত হইতেছে, কিন্তু আধুনিক মানুষ সেই বড় কথাটি ভুলিয়া গিয়াছে যে All great in art is praise—যে শিল্পের মধ্যে যাহা মহৎ তাহা স্তব। যিনি যাহাই বলুন সেই ভূমাশিল্পীকে ছাড়াইয়া যাইবার সাধ্য কাহারও নাই। ছবি দেখিতে কোন্ চিত্রশালায় যাইব? একবার ঐ রাজপথে বাহির হইয়া দেখি—নীলাম্বরতলে কি বিপুল প্রাণপ্রবাহ চলিয়াছে—ছবির পর ছবি জাগিতেছে, মিলাইতেছে—কেহ বৃদ্ধ, কেহ বালক, কেহ যুবা, কেহ বালিকা, কেহ তরুণী, কেহ বৃদ্ধা—তাহাদের মুখে জীবনের কত অভিজ্ঞতার চিহ্ন—কত বেদনা, কত আনন্দ, কত করুণা,—এত মানুষের ছবি! নগর ছাড়াইয়া গ্রামে—দেশ হইতে দেশান্তরে, বিশ্বপ্রকৃতির কত বিচিত্র ছবি—কোন্ চিত্রশালায় গেলে এই ছবির তুলনা মিলিবে? এই জীবন্তছবির সঙ্গে কি চিত্রশালার ছবি মেলে? যদি মেলে ভালই, শিল্পে বিশ্বপ্রকৃতিতে সেখানে অভিন্নাত্মা—কিন্তু যদি না মেলে, তবে শিল্পকে লইয়া

যতই নাচিয়া কুঁদিয়া অস্থির হও, তাহা চিরন্তন নয় জানিবে। কারণ All great in art is praise—বড় শিল্প তোমাকে বারবার প্রকৃতির মধ্যেই ঠেলিয়া দিবে। তেম্‌নি কোথায় গিয়া সঙ্গীত শুনিব? কোন্ মিউজিক হলে কোন্ বিটোভেন মোজার্টের রচনা? কাণ পাতিয়া শুনি দেখি—জগৎজুড়ে উদার সুরে আনন্দ গান বাজে—কত মানবকণ্ঠে, কত পবন প্রচারে, কত বিহঙ্গ কাকলীতে, কত পল্লব মর্ম্মরে, কত নদীর কলতানে, সমুদ্রের তরঙ্গ-গর্জ্জনে—সেই সম্মিলিত বিশ্বমহাসঙ্গীতের কাছে কোন্ তানসেন কোন্ বিটোভেন মোজার্ট লাগেন? যে সকল লোক পশ্চিম দেশে অধুনা "আর্ট আর্ট" করিয়া সমস্ত জীবন সৌন্দর্য্যকে সৌখীন করিয়া সকল প্রয়োজন হইতে তুলিয়া জীবনের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আলেয়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হইতেছেন, তাঁহারা জানেন না যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যিনি শিল্পী, যিনি কবি, তাঁহার এই বিপুল চিত্রশালায় ও কলানিকেতনে কোন ভেদবিভেদ নাই। সেখানে প্রয়োজন এবং সৌন্দর্য্য একত্র মিলিয়া আছে, সেখানে কর্ম্মের সঙ্গে আনন্দ সুগ্রথিত, সেখানে জটিলতা সরলতা সহোদর ভাইয়েরই মত। ধর্ম্মকে বাদ দিয়া, নীতিকে খেদাইয়া, প্রেমকে অপমানিত করিয়া, সমস্ত মনুষ্য সমাজকে আহ্বান না করিয়া, কেবল সৌন্দর্য্য-বিলাস পরিতৃপ্তির জন্য যে শিল্পসাহিত্য তাহা কখনই সত্য নহে। কাউণ্ট টলস্টয় তাঁহার "হোয়াট্ ইজ্ আর্ট" নামক গ্রন্থে এই কথা বলিবারই চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু শিল্পের তরফ্ হইতে না বলিয়া, কেবল চারিত্রনীতির দিক্ হইতে বলিবার জন্য তাঁহার বক্তব্য কথাটি মারা গিয়াছে—সে নিতান্ত একদিকঘঁ্যাষা কথা হইয়াছে। ঐ পূর্ণিমার কবি, ঐ Base of all metaphysics এর কবি ঠিকই

লিখিয়াছেন যে প্রত্যক্ষ মানুষকে, প্রত্যক্ষ বিশ্বজগৎকে বাদ্ দিয়া কতকগুলি কথা, কিম্বা কতকগুলি সেই রকমই নিরর্থক রং আর আকার আর সুর দিয়া যে মানুষ আপনাকে ভুলাইতে পারে ইহাই আশ্চর্য্য। না—শিল্পসাহিত্যকেই আজ সকল জায়গায় নামিতে হইবে—যেখানে মানুষ কৃষিক্ষেত্রে, কারখানায় প্রয়োজনের দাসত্ব করিয়া মরিতেছে, সেখানে সেই মজুরের জীবনকে একটি নূতন সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দেখাইতে হইবে—যেখানে নীতিবোধ উগ্র, ধর্ম্মভাব শুষ্ক, সেখানে সমস্ত বিশ্বসৌন্দর্য্য, মানুষের প্রেমের সকল লীলাকে আনিয়া নীতিকে সুন্দর ও সৌন্দর্য্যকে নীতিময় করিয়া দিতে হইবে—যেখানে বড় বড় রাষ্ট্রচেষ্টা কেবলি কল গড়িয়া মানুষকে সেই কলের সামিল করিয়া তুলিতেছে, সেখানে আনন্দের হিল্লোল বহাইতে হইবে। শিল্পের ক্ষেত্র সমস্তই—ভগবানের সৃজনের সঙ্গে তাহার একাসন। তাঁহার সমস্ত চেষ্টা যেমন আনন্দরূপ অমৃতরূপ ধারণ করিয়াছে, মানুষেরও এই বিপুল চেষ্টাকে সেই একই রূপ ধারণ করিতে হইবে। যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে নাও হয়, তথাপি কর্ম্মে ও সৌন্দর্য্যে, ধর্ম্মে ও সৌন্দর্য্যে কদাচ বিরোধ যেন না হয়। আধুনিক যুগের শিল্পসাহিত্য সেই কথাই বারবার করিয়া জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করিবে।

কবিতা

বিশ্বজগতে একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই দেখিতে পাই যে ইহার মধ্যে প্রয়োজনের দিক এবং আনন্দের দিক এই উভয় দিকই সমান বিদ্যমান। এত বড় যে আশ্চর্য্য বিশ্ব তাহাকে প্রয়োজনের দিক হইতে দিব্য সীমাবদ্ধ করিয়া ভাবা যায়; কারণ আলো, বাতাস, অগ্নি, জল প্রভৃতির সমস্তেরই বিচিত্র কার্য্য রহিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের ব্যবহার কি তাহা জানিয়া মনুষ্য-সভ্যতা এক পা এক পা করিয়া উন্নতির দিকে অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্বজগতে আসিয়া অবধি মানুষ এই ব্যবহারের দিকটাকে সর্ব্বপ্রথমে ভাল করিয়া ধরিয়াছিল ও চিনিয়াছিল।

এখন যদিও মানুষ বিশ্বকে শরীরের প্রয়োজন সাধন করিবার মস্ত কারখানা বলিয়া মনে করে না, তথাপি তাহার সে দিকটা যে একেবারে চাপা পড়িয়া গিয়াছে তাহাতো বলা চলে না। সকল শরীরেরই বৃহৎ বিস্তার এই বিশ্বশরীর, ইহাকে প্রতিনিয়ত খাইয়া তবে প্রাণ বাঁচিয়া আছে। নিশ্বাসের জন্যই এত বড় আকাশ, দৃষ্টির জন্য এত বড় সীমাহীন লোক লোকান্তর, শ্রুতির জন্য বায়ুপ্রবাহ, পুষ্টির জন্য অন্নজল। যিনি যত বড়ই কবি হোন্ শরীরের প্রয়োজনকে অস্বীকার করিবার কোন উপায় তাঁহার নাই।

কিন্তু এই বিশ্ব যে এত প্রয়োজনের, ইহার কোন জায়গায় তাহার লক্ষণ ধরা পড়িল না। সকল প্রয়োজনকে অন্তরাল করিয়া দিয়া ইহার অপরিসীম সৌন্দর্য্য আপনার ভরপুর আনন্দে আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এত বড় আকাশ দেখিয়া কি

কাহারও মনে হয় যে, এ কেবল আমার নিশ্বাস লইবার জন্যই আছে? সুপক্ব শস্যক্ষেত্র দেখিয়া কৃষকের মনে অর্থলাভের যে চিন্তাই জাগুক্, তাহার রসনা কখনই লুব্ধ হইয়া উঠে না। সুবর্ণে হরিতে নীচ হইতে উপর পর্য্যন্ত মণ্ডিত হইয়া যখন সুদূরবিস্তীর্ণ ধান্যশীর্ষ বায়ুস্পর্শে কম্পিত হইতে থাকে, তখন জঠরানলের ক্ষুধা যতই থাক্, সে ক্ষুধা তো মাথা জাগাইয়া উঠে না। নদীর জলে পিপাসা মিটিলেও কেহ তাহাকে কলসীর জলের মত কেবলি পিপাসা মিটাইবার সামগ্রী বলিয়া জ্ঞান করে না। প্রয়োজন বাস্তবিক কতটুকু? সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়াও বর্ণে গন্ধে সঙ্গীতে রসে রূপে—আনন্দ ছাপাইয়া উঠিয়াছে, এবং কত অজস্র অপব্যয়ে আপনাকে পরিকীর্ণ করিতেছে। ইহার এত প্রয়োজন সাধন করিয়াও এত আনন্দ!

বাস্তবিক প্রয়োজনের সঙ্গে প্রয়োজনের অতীত আনন্দের এই যে মাখামাখি মিলন বিশ্বে দেখা যায়, ইহার একটি নিগূঢ় তাৎপর্য্য মনে না আসিয়া পারে না। সেটি এই যে, অনন্ত আপনাকে অনন্ত করিয়া দান করিতেছেন। তাঁহার আনন্দকে কেহ বা পেট ভরাইবার শারীরিক অভাব মিটাইবার দিক্ হইতে ভোগ করিতেছে, কেহ বা তাহার মধ্যে নানা নিয়মের ব্যাপার দেখিয়া আনন্দ পাইতেছে, কেহ বা তাহার উপরে একটি সৌন্দর্য্যের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সেই আনন্দকেই অন্যরূপে ভোগ করিতেছে, কেহ বা তদপেক্ষা গভীরতর স্থানে সকল রসের অন্তরালে একটি অনির্ব্বচনীয় সত্তার সান্নিধ্য উপলব্ধিতে ভোগ করিতেছে। সীমা এইরূপে সীমার রেখাকে অসীমতার দিকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কিন্তু সেই সমগ্রতার আনন্দটির কোথাও ব্যত্যয় ঘটে নাই।

এই প্রয়োজন যদিও বিজ্ঞানের উৎপত্তির কারণ, তথাপি বিজ্ঞান

প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীটুকু পার হইয়া কোন্ রহস্যের গভীরতার মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে দেখিতে পাই। এক সময়ে মানুষ অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃত ব্যাপারকে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বলিয়া জানিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বস্তুগত পার্থক্য কল্পনা করিয়াছিল। ক্রমে দেখা গেল যে পদার্থ বাস্তবিক অনেক নাই, সমস্ত পৃথিবী এবং সৌরজগৎ কয়েকটি মূল পদার্থ দ্বারা গঠিত। বায়ুকে ইচ্ছামত তরল করা যায়, কঠিন করা যায় আবার কঠিনতম পদার্থকেও বায়ুতে পরিণত করা যায়। অতি সূক্ষ্ম পরমাণুর দ্বারা সকল বস্তুই গঠিত এবং ঠিক মাপকরা পরিমাণে তাহাদের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়া থাকে। পদার্থ যেমন অনেক নাই, শক্তিও সেইরূপ অনেক নাই, যদি চ শক্তির রূপরূপান্তর অনেক। শক্তিকে বিনাশ করাও কোন মতেই সম্ভাবনীয় নহে। রসায়ন ও পদার্থ-তত্ত্বের এই সকল আবিষ্কারে এই একটি কথা গাঝাড়া দিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, যে প্রকৃতির মধ্যে সমস্তই কেবল চলার মুখে আছে, একেবারে নিশ্চল স্থিতিশীলতা প্রকৃতির মধ্যে কোথাও নাই।

ইহার পর জীববিজ্ঞানে যখন অভিব্যক্তিবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন সেখানেও এই একই কথা আরও স্ফুটতর প্রত্যক্ষতররূপে প্রতিভাত হইল। দেখা গেল যে ক্রমাগত একই জীবকোষ আপনাকে কত বিচিত্র জীবদেহের মধ্য দিয়া পরিণত করিয়া আসিয়াছে—কত বা বিনষ্ট হইয়াছে কত বা টিঁকিয়া গিয়াছে। রূপ হইতে রূপান্তরে, অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে কেবলি যাত্রা—বিশ্বজগতে এই এক আশ্চর্য্য লীলা! এখানে একং রূপং বহুধা ভবতি—একরূপই নানা হইয়া উঠিতেছে।

মানুষের মনকে বিজ্ঞানের এই বিশ্বতত্ত্ব একটি অভাবনীয় রসে পূর্ণ না করিয়া পারে না। তাহাকেও অবশেষে সাহিত্যশিল্পকলার

দিকে ঠিক এমনি করিয়া তাকাইয়া বলিতে হয়, যে এই তত্ত্ব যে শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে—সাহিত্যের মধ্যেও এই তত্ত্বেরই কারখানা। সেখানে মানুষের মানসজগতেও এই কাণ্ডটি চলিয়াছে—কেবলি রূপ হইতে রূপান্তরে যাত্রা, তাহার সীমা নাই, সংখ্যা নাই। বিশ্বজগতে নিয়ম যেমন সরল, কিন্তু বৈচিত্র্য অসংখ্য, তেমনি মানসজগতেও গুটিকতক ভাবমাত্র সম্বল, কিন্তু রূপের আর অন্ত নাই। বিশ্বকে যে আমরা কাব্য বলিয়াছি, এ পর্য্যন্ত কোন্ পাঠক তাহার বৈচিত্র্যের শেষ পাইয়াছে? এক একজন বৈজ্ঞানিক এক একটা থিওরি খাড়া করিয়া মনে ভাবেন, এইবার বুঝি রহস্য ফাঁস হইয়া গেল, আর কিছুই বাকি রহিল না—কিন্তু আবার আর একজন আসিয়া নূতন সব তথ্য হাজির করেন এবং পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত মতের সঙ্গে তাহাদের সামঞ্জস্য করা আর চলে না। বাস্তবিক মূল বিশ্বতত্ত্ব লইয়া বাদানুবাদের অন্ত নাই—প্রত্যেকেই নিজ নিজ মতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু কিছুই চূড়ান্তরূপে নিষ্পন্ন হইতেছে না। মত কেবল মতান্তরকে অগ্রসর করিয়াই আনিতেছে।

এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়, তাহা এই যে অনন্ত অনন্তরূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার এই অপরূপ বিশ্বকাব্যটি নিয়তই সৃজ্যমান। তত্ত্ব যতই তাঁহাকে বাঁধিবার জন্য শৃঙ্খল লইয়া পিছনে পিছনে ছুটুক—তাহার ছোটার কোন দিন অন্ত হইবে না। রহস্যভবনের দরজা একটির পর একটি খুলিয়াই চলিবে, প্রতিবারই মনে হইবে এই বুঝি শেষ। কিন্তু শেষ যে বস্তুতই নাই সে কথাটা খুঁজিতে খুঁজিতেই জানা যাইবে। তবু এই খোঁজাতেই আনন্দ, কারণ খুঁজিয়া

কিছু পাওয়া যাইতেছে না তাহা নহে। যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুই লাভ।

সাহিত্য ও কলার সঙ্গে বিজ্ঞানের এই যোগের জায়গাটা বেশ দেখা যাইতেছে বটে, কিন্তু ভেদের জায়গাটা আরও বেশি স্পষ্ট। বিজ্ঞানকে তত্ত্ব বাহির করিতেই হইবে, সেই তাহার কাজ। শেষ তত্ত্ব অবশ্য মিলুক্ বা না মিলুক্। কিন্তু সাহিত্য-শিল্পকলার সে বালাই নাই। তাহাদের মধ্যে কোন অন্বেষণ নাই, কেবল প্রাপ্তিরই কথা। সেইজন্য যদিচ বিজ্ঞানের মধ্যদিয়া বিশ্বজগতের অন্তহীন বৈচিত্র্যের একটা প্রকাণ্ড পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেই বৈচিত্র্যগুলিকে যে নিয়মসূত্রগুলি গাঁথিয়া রাখিতেছে, তাহাদিগকেও ধরিবার চেষ্টা করা যায়—কিন্তু বৈচিত্র্যের ভিতরকার আনন্দের কোন বার্ত্তা বিজ্ঞানে মেলে না। বিজ্ঞান এই বিশ্বকাব্যের অক্ষরগুলি জড়ো করে, এবং কি ছন্দে তাহারা বাঁধা তাহা আলোচনা করিয়া বাহির করে, কিন্তু ইহার অন্তর্নিহিত যে একটি বড়ভাব এই ছন্দে বন্ধে রূপে ভাষায় আপনাকে অহরহ প্রকাশ করিতেছে, সেই ভাবটিকে বিজ্ঞান দেখিতেই পায় না। কেবল যেটুকু বাহিরের যেটুকু প্রতিভাত মাত্র, বিজ্ঞান তাহাকেই জানে, যাহা অন্তরের ও যাহা অব্যক্ত তাহার সম্বন্ধে সে উদাসীন। বিশ্বকাব্যের মধ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান এই এক দ্বন্দ্ব-রেখা টানিয়া তাহাকে দুইদিক দিয়া আলোচনা করিতেছে।

বিজ্ঞানে সেই জন্য পদে পদে প্রমাণ-প্রয়োগের দরকার, কিন্তু সাহিত্যে তাহার কোন আবশ্যকতা নাই। সে আপনিই আপনার প্রমাণ।

আমরা সাহিত্য-শিল্পকে একত্র করিয়া এতক্ষণ কথা বলিয়াছি।

কিন্তু এক্ষণে আরও একটু বিশেষের মধ্যে আমাদের যাওয়া প্রয়োজন। কারণ আমরা আজ কবিতার সম্বন্ধেই আলোচনা করিব। কবিতা যে সঙ্গীত বা চিত্রকলা বা আর কিছু হইতে মূলতঃ স্বতন্ত্র এমন আমরা মনে করিনা তাহা পূর্ব্বে "শিল্প" প্রবন্ধেই আমরা দেখিয়া আসিয়াছি। তবে প্রকাশের দিক্ দিয়া ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য অবশ্যই রহিয়াছে।

বিজ্ঞানের সঙ্গে কবিতার কোথায় ঐক্য আছে এবং কোথায় নাই তাহা দেখা গেল। আমরা বলিলাম যে বিশ্বসৃষ্টির ন্যায় কাব্যসৃষ্টিতেও ভাব আপনাকে কেবলি রূপ রূপান্তরে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে—তাহার আর শেষ নাই। এই জন্য কবিতাকে জগৎময় সকল জিনিসের সঙ্গে সকল জিনিসের সাদৃশ্য দেখিয়া বেড়াইতে হয়, কারণ সেই সাদৃশ্যের ভাষায় আপনার মনের সমস্ত ভাব তাহাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কবিদের নিকট হইতেই তো আমরা আমাদের ভাষা পাইয়াছি, তাই দেখ না কেন এমন অল্প কথাই আমরা বলি যাহা কোন না কোন জিনিসের সাদৃশ্য জ্ঞাপন করে না। ইহার আর তো কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না, কেবল ইহাই মনে হয় যে আমাদের মানস-লোকের সঙ্গে বিশ্বলোকের একটা আশ্চর্য্য মিল আমরা এক জায়গায় আবিষ্কার করিয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে আমাদের ভিতরে যাহা হইতেছে, বাহিরে তাহার অনুরূপ ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। বাহিরের সেই সকল দৃশ্যকে বস্তুকে ঘটনাকে যদি আমরা মনোভাবের সঙ্গে এক করিয়া গাঁথিতে পারি, তবেই যেন বাহিরকে আমরা ঠিকমত ব্যবহার করি। নহিলে তাহার সঙ্গে প্রয়োজনের সম্বন্ধ মাত্র রক্ষা করিয়া তাহাকে

অত্যন্ত দূর করিয়া দেখা হয়। কিন্তু যখনি সে ক্রমাগতই ইঙ্গিত করে ইসারা জানায়—কত দৃশ্য গন্ধ শব্দ প্রেরণ করিয়া মনের ভাবকে স্ফুট আকারে প্রকাশ করিবার জন্য কত সাহায্যই করে,—তখনি তাহার দূরত্ব ঘুচিয়া গিয়া তাহার পরম তাৎপর্য্যটি আমাদের কাছে সুগোচর হইয়া উঠে। বিশ্বকে তখন আমরা আর মন হইতে পৃথক্ করিয়া দেখিতেই পারি না। বিশ্ব যে মনেরই প্রতিরূপ সে কথাটা নিঃসংশয়ে বুঝি এবং তাহার সাহায্যে ভিতরের অস্পষ্ট ভাবগুলিকে বাহিরে আকার দান করিয়া বাঁচি।

কবিতার মধ্যে কোন্‌টা তুমি সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর বলিয়া মনে কর? তাহার ভাব না তাহার প্রকাশ? আমি তো ভাবকে বড় স্থান দিতে রাজিই নই—কারণ ভাব আসলে অল্পই—তাহা একরকম আমাদের সকলের মধ্যেই ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে। কবিতায় দর্শন বিজ্ঞানের মত কোন আশ্চর্য্য তত্ত্ব কেহ প্রত্যাশা করে না। কারণ তত্ত্ব-নিরূপণ তাহার কাজ নহে। কিন্তু তাহার মধ্যে প্রধান বিস্ময় তাহার প্রকাশ—কারণ সেইখানে সে এমন করিয়া অত্যন্ত পরিচিত জিনিসকেও দেখায়, যাহা পূর্ব্বে কেহ দেখে নাই। সেই জন্য কবিতার মধ্যে প্রধান সম্পদই তাহার উপমা। যিনি যত বড় জায়গায় ভাবকে ছাড়া দিতে পারেন, তিনি ততই বিস্ময় জাগান। শুধু তাই নয়। বিশ্বকেও তিনি ততই আপনার প্রকাশের সীমার মধ্যে টানিয়া আনেন। প্রকাশের এই যে একটি নবীনতা এবং প্রসার, আমিতো মনে করি কবিতার ইহাই প্রধান বিশেষত্ব।

বস্তুত এইখানে বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে কবিতাসৃষ্টির ভারি একটি মিল আছে। আমরা দেখিলাম যে ক্রমাগত একরূপ আপনাকে

নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে লইয়া যাইতেছে, বিশ্বজগতে এই এক কাণ্ড চলিয়াছে। কবিতাতেও মনের ভাবকে রূপ দান করিবার কার্য্যে এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। রূপ দিলেই যে সে ফুরাইয়া গেল তাহা নহে, সে চলিতেই থাকিল। তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে যাহাকে রূপ দিতে যাই, সে জিনিসটি কি রহস্যময়! ধর আকাশের সৌন্দর্য্য। আমার মনে ইহা যে ভাবোদ্রেক করে তাহাকে রূপ দিতে গেলেই আমি দেখি, যে আমি বলিয়া কুলাইয়া উঠিতে পারি না। আমি যে উপমাই দিই তাহা যেন শত শত ভাবী উপমার মুখবন্ধ হইয়া থাকে মাত্র। সেই জন্যই তো কোন বস্তু কবিতার কাছে পুরাতন হইতে পারে না। তাহার সৃষ্টি যে থামে না। বিশ্বসৃষ্টির মত নব নব রূপে বিকশিত হইয়া কালে কালে তাহা অগ্রসর হইতে থাকে।

আজ শরতের দুপর। অনেক দিন পরে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গিয়া রোদ দেখা দিয়াছে। নীল আকাশ মেঘমুক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু দুটা একটা লঘু মেঘ রৌদ্রে শুভ্র হইয়া সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ আকাশের নীলিমা দেখিয়া বুকের ভিতরটা আনন্দে কেমন করিয়া উঠিতেছে। দূরে ধানের ক্ষেতের সবুজাভায় চোখ স্নিগ্ধ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এই শরতের সৌন্দর্য্যটি কেমনতর? কালিদাস লিখিতেছেন :—

> ব্যোমরুচিরজতশঙ্খমৃণালগৌরৈ
> স্ত্যক্তাম্বুভির্লঘুতয়া শতশঃ প্রযাতৈঃ
> সংলক্ষ্যতে পবনবেগচলৈঃ পয়োদৈ
> রাজেব চামরবরৈরুপবীজ্যমানঃ।

জলশূন্য হওয়াতে মেঘ সকল রৌপ্য শঙ্খ ও মৃণালের ন্যায় শ্বেতবর্ণ

ও লঘুতর হইয়াছে। তদবস্থায় পবনবেগে শতদিকে পরিচালিত হইয়া প্রয়াণ করাতে আকাশমণ্ডল কোথাও উৎকৃষ্ট চামরসমূহে উপবীজিত রাজার ন্যায় সংলক্ষিত হইতেছে।

এই একটিমাত্র শ্লোকে আমার সমস্ত দুপুরের অব্যক্ত ভাবটি যাহা প্রকাশের জন্য আঁকুপাঁকু করিতেছিল তাহা একটি রূপ লাভ করিল। আমি রক্ষা পাইলাম। আমি প্রকাশ করি আর নাই করি, আমার ভাবের ঠিক্ রূপটি আমি দেখিলাম। কিন্তু এই উপমাটি কি চূড়ান্ত? আর কোন উপমা নাই? আর কোন কবি শরতের এই সৌন্দর্য্য কি দেখে নাই? এ যেমন একটি রূপ, তেমনি বিদেশের একজন কবি লিখিতেছেন:—

"On a half reap'd furrow sound asleep
Drowsed with the fume of poppies, while thy hook
Spares the next swath and all its twined flowers"

অর্দ্ধকর্ত্তিত ক্ষেত্রের হলদীর্ণ গর্ত্তের মধ্যে শরৎ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়া আছে, পপির ঘন গন্ধে তাহার নিদ্রাবেশটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে—তাহার নিড়ানী পার্শ্ববর্ত্তী তৃণ ও আগাছাগুলিকে এখনো উপড়াইয়া ফেলে নাই।

আবার বাংলাদেশের কবি লিখিতেছেন:—

মাতার কণ্ঠে শেফালিমালা
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।

এমনি করিয়া তিনজনের কাছে শারদসৌন্দর্য্য তিন ভিন্ন রূপ

বহন করিয়া আনিয়াছে। একজন তাহাকে রাজরূপে দেখিলেন, একজন নিদ্রিত কৃষকরূপে এবং একজন মাতৃরূপে। তিন রূপের মধ্যে কত বিভিন্নতা; অথচ পাশাপাশি যখন পড়িতেছি, তখন আমাদের মন বলিতেছে, হাঁ তিনই সত্য। সত্যই শরতের একটা জম্‌কাল ভাব আছে যাহা রাজার সঙ্গেই তুলনীয়। ইহার মধ্যে একটা দূরের স্বপ্ন আছে, একটা মোহ আছে যাহার নিদ্রার সঙ্গেই মিল হয়। এবং ইহার মধ্যে একটি দান করিবার ভাব আছে যাহা মাতার অজস্র স্নেহ বিতরণেরই সমতুল্য। এমন আরও কত কবির কাছে কত রকমে এই শরৎ দেখা দিয়াছে তাহা কে জানে!

এখানে যদি জিজ্ঞাসা কর যে তবে কি কবিতার কোন বড় বিষয় নাই—তাহার মধ্যে কোন বড় ভাব নাই—সে কি শুধুই কতগুলি চিত্র বা উপমামাত্র? কতগুলি ছন্দের ঝঙ্কার ও ভাষার ছটা? আমি তাহার উত্তরে বলি যে তা কেন হইবে—তুমি যে কোন ভাবকেই কবিতায় ব্যক্ত করিতে পার আমার কোন আপত্তি নাই। কেবল এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, যে-সকল ভাবের মধ্যে একটি অনির্দ্দেশ্যতা এবং অনির্ব্বচনীয়তা আছে, কাব্যের দরবারে তাহারাই ক্রমাগত বচন ও রূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে। যে সকল বিষয় একেবারে প্রমাণদ্বারা সুনির্দ্দিষ্ট তাহারা কাব্যের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। জ্যামিতিকে তুমি হাজার ছন্দ করিয়া সুর করিয়া পড়িলেও তাহা কবিতা হইবে না—কারণ তাহার মধ্যে একটা অনির্দ্দিষ্টতা ও অনির্ব্বচনীয়তা নাই। কিন্তু আমাদের হৃদয়াবেগ-মাত্রেরই মধ্যে এমন কিছু আছে যাহাকে ঠিক্‌মত বলিয়া উঠা শক্ত, শেষ করিয়া ফেলাও শক্ত। প্রেম বল, সৌন্দর্য্যবোধ বল,

যে কোন অনুভূতি বল, আমরা তাহাকে বলিয়া উঠিতে পারি না। শুধু অনুভূতি কেন, আমাদের চিন্তা যখন প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া যুক্তির পোষাক আঁটিয়া না বেড়ায়, যখন সে রহস্যের নানা আভাস-ইঙ্গিত ধরিবার জন্য অনুভূতির সঙ্গে আসিয়া মিলিত হয় তখন তাহাও কবিতার বিষয়ীভূত হয়। যেমন ওয়ার্ডস্বার্থের কবিতা, বা এমার্সনের কবিতা। আমাদের দেশে যেমন কবীরের কবিতা। কারণ তখন সে রূপ প্রার্থনা করে, সে প্রকাশ চায়। প্রমাণের নালবন্দী হইতে তাহার আর ইচ্ছা থাকে না, সে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত উড়িবার দুইটা বড় বড় পাখা চায়। ক্রমেই দেখা যায়, যে নূতন নূতন অনুভূতি মানুষের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে এবং কাব্যে তাহারা প্রকাশ লাভ করিতেছে। তাই ভাবসম্বন্ধে বাচবিচার করা যায় না—কেবল এইটুকু বলা যায় যে তাহার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা থাকা দরকার।

আমরা দেখিলাম যে উপমা কিম্বা চিত্রের দ্বারা ভাব আপনাকে ভিতর হইতে বাহির করিয়া আনে এবং আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু শুধু উপমায় বা চিত্রে কেন? সঙ্গীতেও ভাবকে রূপ দেওয়া যায়। ঐ শরতের যেমন চিত্র দেখিলাম তেমনি গানও তো আছে; যেমন ধর:—Tears, idle tears, I know not what they mean—টেনিসনের সেই গানটি—

Tears, idle tears, I know not what they mean
Tears from the depth of some divine despair
Rise in the heart, and gather to the skies
In looking on the happy Autumn fields,
And thinking of the days that are no more.

কিম্বা রবীন্দ্রনাথের :—

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দমধুর হাওয়া
দেখিনাই কভু দেখিনাই এমন তরণী বাওয়া।
কোন্ সাগরের পার হতে আনে
কোন্ সুদূরের ধন
ভেসে যেতে চায় মন,
ফেলে যেতে চায় এই কিনারায় সব চাওয়া সব পাওয়া
দেখিনাই কভু দেখিনাই এমন তরণী বাওয়া!

চিত্রেই দাও, গানেই দাও—ব্যক্ত করা লইয়া কথা। যদি পূর্ণভাবে তোমার ভাবটিকে বাহিরে ধরিতে পারিলে তবেই তাহা কবিতা হইল। যদি বাহিরে ধরিতে না পারিয়া কেবল কতগুলি শুষ্ক শব্দ ও সংস্কারগত কথার জাল তৈরি করিলে, যাহার মধ্যে কোন নূতনত্বের স্বাদ নাই তবেই কবিতা মাটী হইয়া গেল।

ঐ যে দুইটি গানের উল্লেখ করিলাম উহাদের মধ্যেও শরতের দূর স্বপ্নের এবং আলস্যজড়িত স্মৃতির ভাবটি কেমন জমিয়াছে দেখত! প্রথমটিতে কোন্ দূর স্মৃতির দিকে চাহিয়া কি একটি দুঃখের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলা এবং দ্বিতীয়টিতে কি একটি উদাস-করা সুদূরে চলিয়া যাইবার ব্যাকুলতা জাগিয়াছে। শরতে এরূপ ভাব আমাদের সকলেরি মনে আসে যায় তাহাতে কি আশ্চর্য্য! কিন্তু তাহাকে যদি ঠিকমত ধরিয়া রাখিতে পারি, হয় কোন উপমায় নয় কোন সুরে, তবেই আমাদের তৃপ্তি হয়। তখন যাহা ভাসিয়া ভাসিয়া আবছায়ার মত বেড়াইতেছিল, তাহা একেবারে একটি রূপের মধ্যে আসিয়া ধরা দিল—বহু বাক্যব্যাকুলতার অবসান হইয়া গেল।

এই যে আব্‌ছায়া ভাবকে স্ফুট করিয়া তোলা এবং উপযুক্ত-রূপে ভাষায় বাহির করিয়া আনা, এ কাজটি নিতান্ত সহজ নহে। আমি একটু পূর্ব্বে বলিলাম যে, ভাব আমাদের সকলেরই মধ্যে ন্যূনাধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু আমরা "নীরব কবি।" অর্থাৎ কোন কবিই নই। কারণ আমরা যাহা অনুভব করিয়া থাকি, প্রথমতঃ তাহাকে ভাল করিয়া ধরিতে পারি না, তাহা ছায়ার মত আসে এবং মিলায়। দ্বিতীয়তঃ যদি বা তাহারা কিয়ৎকাল মনের মধ্যে টি ঁকিয়া থাকে, তাহাদিগকে কেমন করিয়া যে প্রকাশ করিব তাহা খুঁজিয়া পাই না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য বা নারীর সৌন্দর্য্য আমাদের সকলকেই মুগ্ধ করিয়া থাকে,—আমরা এটা বুঝি যে তাহার মধ্যে একটা অনির্ব্বচনীয়তা আছে। কিন্তু তাহাকে কালি-দাস মেঘদূতের একটি শ্লোকে যেমন করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা কি তাহা কখনো পারি ?—

> শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
> বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
> উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
> হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি নতে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

প্রিয়ঙ্গু লতাতে তোমার অঙ্গ, চকিত হরিণীর লোচনে তোমার দৃষ্টিপাত, শশধরে তোমার বদনদ্যুতি, শিখিপুচ্ছে তোমার কেশ, অতিসূক্ষ্ম নদীতরঙ্গসমূহে তোমার ভ্রূবিলাস উৎপ্রেক্ষণ করিয়া থাকি। কিন্তু হে কোপনে, কোন একটিমাত্র বস্তুতে তোমার সাদৃশ্য পাই না।

এই যে সকল বিচ্ছিন্ন সৌন্দর্য্যকে একটি মূর্ত্তির মধ্যে পরিপূর্ণ করিয়া দেখা, যাহা বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে তাহাকে একজায়গায় জড়

করা—তেমনি আবার যে-সৌন্দর্য্য মূর্ত্তিতে বদ্ধ হইয়া আছে তাহাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করিয়া সকল সুন্দর পদার্থের মধ্যে দেখা—আমার কাছে ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয়। এ তো সৌন্দর্য্যকে কোনমতেই স্থূল করিয়া দেখা নয়। যাহাকে মূর্ত্তি বলিয়া জানি, সে যে কত অশরীরী সৌন্দর্য্যের ছায়াপাতে গঠিত—কত লতায়, কত বর্ণে, কত কিরণে, কত রেখার ভঙ্গিমায় যে সেই সব সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যকে কত রকমে ছুঁইয়া ছুঁইয়া গিয়াছি—মূর্ত্তির মধ্যে হঠাৎ সেই সকল স্মৃতি আসিয়া ভিড় করিয়া বসিতে সে মূর্ত্তি কি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে! মূর্ত্তিকে এমন ব্যাপ্ত করিয়া না দেখিলে ইন্দ্রিয়ের উপর তাহার নিষ্ঠুর আঘাত কি কোনমতে ঘুচে? তেমনি আবার সেই সমস্ত আবছায়া অনুভূতিরাশিকে যদি মূর্ত্তি না দেওয়া যায়, তবে কে তাহাদের মর্য্যাদা রক্ষা করিবে? তাহারা জাগিবে এবং মিলাইবে।

কবি-মানুষটি যেমন এই অশরীরী ছায়াময় ভাবগুলিকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারেন, তেমনি সেগুলিকে পরিস্ফুট আকার দান করিয়া সকলের সম্মুখে প্রত্যক্ষবৎ জাগ্রত করিতেও তিনি সমান পটু। কিন্তু এই অস্ফুট জিনিষকে ধরিতে পারা এবং স্ফুট করিয়া তুলিতে পারা কল্পনার কাজ। এই কল্পনার শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে না থাকিলে কখনই কবি হওয়া যায় না। কল্পনা কথাটা আমাদের ভাষায় বড় খাটো এবং হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজীতে যাহাকে fancy বলে আমরা অনেক সময় কল্পনাকে সেই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকি। তাহার মানে অত্যন্ত অস্পষ্ট স্বপ্নলোকের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়ানো এবং কোন বস্তুগত সত্তাকে না ধরিতে পারাই যেন কল্পনা। অথচ কল্পনা ঠিক তাহার বিপরীত। ইংরাজী imagination শব্দটা বরং কল্পনার

যথার্থ অর্থ জ্ঞাপন করিয়া থাকে। কল্পনার আলোকে সমস্ত অস্পষ্ট ভাব স্পষ্ট হইয়া উঠে, যাহা স্মৃতির মধ্যে একসময়ে ছিল কিন্তু তারপর বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে তাহা জাগ্রত হয়, চতুর্দ্দিককার নানাপদার্থ আসিয়া সেই ভাব ও অনুভাবগুলিকে রূপদান করিতে থাকে, তাহারা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। এই যে একটি পরিস্ফুটন ক্রিয়া, ইহাই কল্পনার বিশেষ কাজ। সুতরাং যাহারা ইহাকে অলস স্বপ্নলীলা বলিয়া উড়াইয়া দেয়, তাহারা কল্পনার যথার্থ অর্থই জানে না। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, কবিতা বল, সকল ক্ষেত্রেই কল্পনা ভিন্ন এক পা অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। যাহা খণ্ড ব্যক্ত, যাহা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহা হইতে যাহা দূর ও অব্যক্ত, যাহা অতীন্দ্রিয় তাহার দিকে দৃষ্টিকে কে প্রসারিত করিবে? কল্পনা। প্রত্যেকটি খণ্ড পদার্থের ভিতরে যে সেই অব্যক্তের সেই দুর্লক্ষ্যের নানা আভাস-ইঙ্গিত হীরকের নানা মুখ হইতে বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মির ন্যায় বিকীর্ণ হইতেছে, সে তত্ত্বটি একমাত্র কল্পনারই জানা আছে। সুতরাং এই বিশেষ শক্তিটি না থাকিলে কবির কবিত্ব নিতান্ত অলস জল্পনা ও স্বপ্নের বিলাস মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। তাহা কোন একটি গভীরতর সৌন্দর্য্যের কেন্দ্রস্থানে গিয়া পৌঁছায় না, তাহার মধ্যে কোন সত্যকে পাওয়া যায় না।

অথচ শুধুই যে কল্পনা খাটাইয়া কাব্য রচনা সম্ভব হয় এমন মনে করিলে ভুল হইবে। কবিতার মুখ্যে একটা স্বতোচ্ছ্বসিত স্ফূর্ত্তি আছে, চেষ্টা করিয়া গড়িয়া পিটিয়া কবিতাসৃষ্টি সম্ভবে না। এইজন্য আমরা বলিয়া থাকি যে বড় কবি মাত্রে inspiration হইতে লেখেন, অর্থাৎ তাঁহারা ভিতর হইতে একটা প্রেরণার দ্বারা চালিত হইয়া লেখেন। কাব্যকে আপন ইচ্ছামত তৈরি

করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে থাকে না। গ্রীকেরা ম্যুস অর্থাৎ কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের আরাধনা করিত, তাঁহাদের আবির্ভাব ভিন্ন যে কাব্য কিম্বা সঙ্গীত কিছুই সম্ভব হয় না, তাহা তাহাদের বিশ্বাস ছিল। আমাদের দেশে বীণাপাণির স্তব না করিয়া ও তাঁহার প্রসাদ লাভ না করিয়া কেহ বাক্য পাইবার ভরসা রাখে না। ইহার কারণ আর কিছুই নয়, যাহারা কিছু সৃষ্টি করে তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পায় যে—কোন দিন তাহাদের যেমন আপনিই ভাবের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, প্রকাশের আর কোন বাধা থাকে না, অন্যান্য দিনে তাহা হইবার জো নাই। এতো তর্কযুক্তির ব্যাপার নয়, এ একেবারে অভিজ্ঞতার কথা। যেদিন বিশেষ করিয়া ভিতর হইতে কোন প্রেরণা না জাগে, সেদিন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও একছত্র ভাল কবিতা বা তুলির দ্বারা একটা ভাল আঁচড় কাটিবার সাধ্য কি! এ ঠিক বসন্ত আর শীতের মত। শীতে সমস্ত অসাড়, নির্জীব—না আছে গাছপালার শ্যামলতা, না আছে পাখীর গান—না মিলে পুষ্পের সৌরভ—কিন্তু কোথা হইতে হঠাৎ একটু হাওয়ার বদল যেমনি অনুভব করা গেল, অমনি যাদুকরের মায়াযষ্ঠির স্পর্শে যেন, দেখিতে দেখিতে রাতারাতি জীর্ণতরুতে কিশলয় মঞ্জরিত হইয়া উঠিল, সুদূর সমুদ্র হইতে পাড়ি দিয়া পাখীর দল আসিয়া কি অশ্রান্ত কলগান লাগাইয়া দিল, প্রাণ এবং পুলক আর ধরে না! শীতের দিনে বসন্তের এই আনন্দ-নিঃশ্বাসের এই অজস্রবিকীর্ণ শোভা ও সৌন্দর্য্যের কথা কি কেহ মনে আনিতেও পারিত? ঠিক তেমনি, কোন্ দিন যে ঠিক সুরটি ঠিক রূপটি ঠিক ভাবাবেগটি পাওয়া যাইবে, তাহা যদি কবির আয়ত্তের মধ্যে থাকিত, তবে তাঁহার ভাবনা ছিল না। তবে তিনি প্রত্যহই এমন কবিতা লিখিতেন, যাহার তুলনা মিলিত

না। কিন্তু সমস্ত জীবন ভরিয়া সাধনা করিয়াও ক'টা কবিতা তিনি লিখিতে পারেন, যাহা অমর হইবে? সেইজন্য মানুষ নিজের উপর ভরসা না রাখিয়া মূ্যস বা বাগ্‌দেবীর উপর ভরসা স্থাপন করে—সে জানে যে ভিতর হইতে আর কেহ লেখায়। যে ব্যক্তি চিন্তাকরে, কাজ করে, নানা বাজে গল্প করে—তাহার হাতে এমন মায়ামন্ত্র নাই যদ্দ্বারা সে অপরূপকে তাহার তুচ্ছ ভাষার মধ্যে আবির্ভূত করিতে পারে।

সেইজন্য মানুষের মধ্যে একটা দ্বৈত সত্তার অস্তিত্বকে মানা দরকার হয়। রবীন্দ্রনাথ তাহাকে জীবনদেবতা নাম দিয়াছেন। যে মানুষ বুদ্ধি খাটাইয়া চেষ্টা প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে কাজ করে ও চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায় সেই মানুষই যে ভাব সৃষ্টি করে তাহা নহে। কারণ দেখা গেল যে বিশেষ প্রেরণার বলে যে মানুষ একদিন আপনার রচনায় আপনি বিস্ময়বোধ করে, তাহারি অভাবে, অন্যদিন সেই মানুষের মত পঙ্গু ও শক্তিহীন যদি আর কেহ থাকে। ওয়ার্ডস্বার্থের সেই "serene and blessed mood" সেই শান্ত এবং কৃতার্থ মানস অবস্থা যখন "We are laid asleep in body and become a living soul" আমাদের শরীর সম্বন্ধে আমরা নিদ্রিত থাকি এবং জাগ্রত জীবন্ত আত্মা হইয়া উঠি—সেই অবস্থায় লিখিত কবিতাগুলি পাঠ কর এবং Ecclesiastical sonnets নামক চতুর্দ্দশপদীগুলিও পাঠ কর—প্রেরণার বল এবং প্রেরণার দৈন্যে কবিতার যে কি প্রভেদ হয় এক মুহূর্ত্তেই প্রতীতি হইবে। এ যেন দুজন স্বতন্ত্র মানুষের রচনা।

'জীবন-দেবতা'সম্বন্ধে আমি অন্যত্র আলোচনা করিয়াছি। এখানে আবার সে আলোচনা উত্থাপন করিলে অপ্রাসঙ্গিক কথা আসিয়া পড়িবে। কিন্তু আমি এইটুকু বলিতে চাই যে মানুষের মধ্যে এই

যে দ্বৈত সত্তা আছে তাহা ক্রমশই মনস্তত্ত্বশাস্ত্র স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছে দেখিতেছি। আমাদের সচেতন ক্রিয়াশীল সত্তাকেই আমরা ভালরূপে জানি, কিন্তু তাহার নীচে যে বৃহৎ অর্দ্ধচেতন সুপ্ত সত্তাটি আছে তাহার সংবাদে আমাদের প্রয়োজন হয় না, কিন্তু যাহারা সৃজন করিতে চায় তাহাদের খুবই প্রয়োজন হয়। কেন না সেই সুপ্ত সত্তার মধ্যে আমাদের সমস্ত জীবনের সঞ্চয়, এমন কি আমাদের জন্মজন্মান্তরের সঞ্চয়ও হয়ত জমিয়া আছে। আমাদের সচেতন সক্রিয় সত্তা ইহার তুলনায় কত ক্ষুদ্র, খণ্ড ও অসম্পূর্ণ!

এই বুদ্ধির ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে প্রাত্যহিক ব্যাবহারিক জীবনের মধ্যে ভ্রাম্যমাণ সচেতন সত্তাটিকে কিয়ৎপরিমাণে আড়াল করিয়া না দিলে, কোন বড় কাব্য সৃষ্ট হয় বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না। তখনই "we are laid asleep in body and become a living soul," এবং তখনই "we see into the life of things।" তখন সৃষ্টির মধ্যে এমন একটা অপরূপত্ব ও অভাবনীয়তা দেখা দেয় যাহার জন্য আমরা কখনই প্রস্তুত ছিলাম না।

এইবার কবিতার ভাষা ও ছন্দ—তাহার বাহ্যকাঠামো সম্বন্ধে কথা বলিয়া আজিকার মত বিদায় লইব।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কবিতার ভাবের চেয়ে তাহার প্রকাশের মূল্য অধিক। ভাবমাত্রেই পুরাতন, কিন্তু কত নব নব কবির হাতে পড়িয়া তাহা চির নূতন রূপ প্রাপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই নব নব রূপ দানের শক্তিই কবিত্ব। প্রতিভাকে এইজন্য বলিয়াছে নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধি। যে বুদ্ধি শুধু বিচারবিতর্ক করে, যে আপনার বিষয়ের মধ্যেই বদ্ধ হইয়া থাকে, সে প্রতিভা নয়। যে নব নব উন্মেষ লাভ করে তাহাই যথার্থ প্রতিভা।

সুতরাং ভাষা ও ছন্দ দিয়াই কবিত্বের বিচার করা সম্ভব। কেননা তাহাই তাহার রূপ। কিন্তু তাই বলিয়া কি শুধু ছন্দ ও ভাষার ঝঙ্কার ও ছটাকেই কবিত্ব বলিব? এ ভুল বুঝা অন্যায় হইবে। যে-রূপ কোন ভাবের রূপ নয়—সে তো প্রাণহীন দেহের মত। দেহটাকে তো কেহ মর্য্যাদা দেয় না, তাহার মর্য্যাদা প্রাণেরই জন্য। ভাব না থাকিলে রূপ কিসের? পক্ষান্তরে আবার যদি শুধু ভাব হইত, তবে সে দেহহীন প্রাণের মতই হইত—সে ছায়া হইত। সেইজন্য কোন কবির কাব্য আলোচনা কালে আমাদিগকে গোড়ায় দেখিতে হইবে যে, কবির ভাবটা কি, কি ভাব তিনি ব্যক্ত করিবার প্রয়াসী হইতেছেন। দ্বিতীয় নম্বরে দেখিতে হইবে, যে সেই ভাব কি রকম রূপ লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ সে বেশ প্রত্যক্ষ পরিপূর্ণ একটী বস্তুগত জিনিষ হইয়া উঠিয়াছে—না, শুধু একটা সংস্কার, একটা বাক্য মাত্র হইয়া আছে।

যেমন ধর এই বিশ্বপ্রকৃতি। ইহার ভিতরে যে তত্ত্বই বাহির কর, যে ভাবই দেখ—ইহা একেবারে প্রত্যক্ষ—রূপরসে শব্দে গন্ধে পরিপূর্ণ—কিছুমাত্র কাল্পনিক অতীন্দ্রিয় পদার্থ নহে। কিন্তু ইহার মধ্যে কি অতীন্দ্রিয় সত্তা নাই, অতলস্পর্শ গভীরতা নাই? এত আছে যে নিউটনের মত বড় বৈজ্ঞানিককে বলিতে হইয়াছিল যে, আমি রহস্যসমুদ্রের তীরে দাঁড়াইয়া গুটিকতক উপলখণ্ড সংগ্রহ করিতেছি মাত্র—আমার সম্মুখে অনন্ত অগাধ সমুদ্র! কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে এত গভীর হইয়া ইহা এই গোটাকতক ইন্দ্রিয়ের কাছে আপনাকে ধরা দিয়াছে!

কবিতাতেও এই চেষ্টাটি রহিয়াছে—যদিচ বিশ্ব-কবিতার মত এমন পরিপূর্ণ কৃতকার্য্যতা তাহাতে ঘটে নাই। তাহাকে ভিত্তি-

রের জিনিষ বাহিরের করিয়া দেখাইতে হয়। অথচ ভাষার মধ্য দিয়া তাহাকে দেখাইতে হইবে—যে ভাষার সঙ্গে ভিতরের যোগ খুব নিবিড় ও একান্ত হইতেই পারে না। কারণ ভাষা মানুষের প্রয়োজনের জন্যই সৃষ্ট। তাহার সকল অর্থই সীমাবদ্ধ।

ভাষাতে এই জন্য বর্ণ বা সঙ্গীত সঞ্চার করিতে না পারিলে কবিতা হয় না। বিশেষতঃ সঙ্গীতের একটা সুবিধা এই যে তাহাকে কোন অর্থের দাসত্ব করিতে হয় না। তাহার আবেগ অনির্দ্দেশ্যতার অনির্ব্বচনীয়তার আবেগ। সঙ্গীত যখন ভাষার মধ্যে ছিদ্র করিয়া বংশীধ্বনি জুড়িয়া দেয়, তখন ভাষা দেখিতে দেখিতে অপরূপ মহিমায় ও লাবণ্যে মণ্ডিত হইয়া উঠে। তখন তাহার বাধা ঘুচিয়া গিয়া সে এক নিমেষের মধ্যেই ভিতরের ভাবকে বাহিরে বহন করিবার উপযুক্ত হইয়া উঠে।

এই সঙ্গীতের ও চিত্রের সম্পদ যে লেখকের যথেষ্ট নাই, তাঁহার ভাব ও কল্পনা যত বড়ই হোক্—চিরন্তনকালে কবির আসন পাইবার দুরাকাঙ্ক্ষা তিনি কোন দিনই মনে পোষণ করিতে পারেন না। কারণ তিনি অনির্ব্বচনীয় ভাবকে বাহির করিবেন কি উপায়ে? তিনি ভাষার কঠোর বাধাকে নরম করিবেনই বা কি উপায়ে?

আমাদের উপনিষদ শাস্ত্রে ভগবানকে কবি বলিয়াছে। তাঁহার আনন্দ হইতেই সমস্ত জন্মলাভ করিতেছে, আনন্দে জীবিত থাকিতেছে এবং আনন্দেই বিলীন হইতেছে। এই আনন্দই তাঁহার বিশ্বকাব্যের প্রেরণা, ইহা হইতেই তিনি অপরূপ ও অব্যক্ত হইয়াও বিচিত্ররূপে আপনাকে ব্যক্ত করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার আনন্দেরও যেমন শেষ নাই, তাঁহার প্রকাশেরও সেইরূপ শেষ হইতে

পারে না। তাঁহার এই সৃষ্টির মহাপ্রেরণার ছায়ার ছায়া লাভ করিয়া মানব কবি সামান্য উপকরণে সৃষ্টি করিতে বসিয়া যান। কিন্তু এই বিশ্বকাব্যের অনির্ব্বচনীয় অখণ্ডতা আমরা কোন মানব-কবির রচনায় বৃথাই আশা করিব। প্রথমতঃ তাহার মধ্যে সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ প্রয়োজনের ভাব এবং উদার অসীম আনন্দ এ দুইই পাশাপাশি গাঁথা। দ্বিতীয়তঃ তাহার মধ্যে এক আপনাকে নানারূপে ক্রমাগত অভিব্যক্ত করিয়া চলিয়াছে—রূপেরও শেষ নাই এবং যে নিয়মে এই বিচিত্রতা বিধৃত তাহারও শেষ পাই না। অথচ এই চিরন্তন অন্বেষণ ও ব্যর্থ মনোরথের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষ আনন্দ ও রসানুভূতি, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি একেবারে মিলিত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ এক কথায় এই আদর্শভূত মহাকাব্যে সীমা এবং অসীমতা উভয়ে মিলিত ভাবে অবস্থান করিতেছে—সীমা ক্রমাগত আপনার বৈচিত্র্যের রেখা টানিয়া অসীমতায় গিয়া হারাইয়া যাইতেছে এবং অসীমতার ভাবসকল সীমার ভিতরে ভিতরে আপনাকে অনির্ব্বচনীয় অপরূপ রূপে প্রকাশ করিয়া করিয়া কূল পাইতেছে না।

মানুষের কাব্যে আমরা এই অনন্ত পরিপূর্ণতার একটি আভাস মাত্র দেখিতে পাই। সেখানেও প্রথম জিজ্ঞাস্য, কবির কাব্যের প্রেরণাটা কোথায়? কোন্ ভাব তাঁহার মধ্যে বাণী লাভ করিবার উপক্রম করিতেছে? তারপরে জিজ্ঞাস্য, সে ভাব তাঁহার মধ্যে নব নব রূপ লাভ করিয়াছে কি না, বিচিত্রতায় মণ্ডিত হইয়া আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে কি না? সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাস্য যে সেই রূপ কি সম্পূর্ণরূপে সুনির্দ্দিষ্টতার সীমায় বদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, না, তাহার মধ্যে একটি অসীমতার ব্যঞ্জনা নানা দিক দিয়া

বিচ্ছুরিত হইতেছে? সেই রূপের মধ্য দিয়া অরূপের কোন ছায়াভাস জাগিতেছে কি না? এতগুলা প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিলে তবে কোন কবিতা সফলতার পাশমার্কা পাইয়া যায়। চিরন্তন কালের মধ্যে যে তাহার স্থান ধ্রুব হইয়া রহিয়া গেল, এ সম্বন্ধে আর সন্দেহের কোন স্থান থাকে না।

সৌন্দর্য্য ও মহিমা

একবার একজন ইংরাজীভাষী কবি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি মহিমার ভাব যতটা জাগায়, সৌন্দর্য্যের ভাব ততটা জাগায় না, তাহা অনির্ব্বচনীয় কিন্তু মুগ্ধকর নয়। দেখনা কেন, আমাদের বাংলাদেশটা কেবলি সমতল প্রান্তর, সুদূর দিগন্ত পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে। এখানকার আকাশ বাষ্পমুক্ত ও অনবরুদ্ধ, এবং নদী, মাঠ, বন, গ্রাম সমস্তই কেমন বৃহদায়তন ও দূরবিস্তৃত—এখানে তাই মানুষের মনকে স্বভাবতই উদাসীন ও উন্মনা করিয়া দেয়। ইংলণ্ডে সমস্তই ইহার বিপরীত। সেখানে সবই ছোটখাট, আয়ত্তের মধ্যে। নদীগুলি কোথাও পার্ব্বত্যপ্রদেশে সঙ্কীর্ণ উপলপথ দিয়া সফেন কলহাস্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও সমতল স্থানে বনগুল্মে শৈবালে আচ্ছন্ন হইয়া শীর্ণধারায় ক্ষীণস্রোতে বহিতেছে। তাহাদের কটি বেষ্টন করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাঁকো—শুভ্র পথগুলি—বেড়াদেওয়া ক্ষেতগুলি—চিমনিওয়ালা কুটীরগুলি, কুটীরের দেয়ালে আইভিলতা উঠিয়াছে, আঙুরের লতায় বাড়ীগুলিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনি করিয়া ফুলটি, লতাটি, পথটি, বাগানটি, পাহাড়টি, নদীটি—

সবই ছোটখাট সীমায় ধরা দেয়, কোথাও হাত ছাড়াইয়া পালায় না। তিনি আরও বলিলেন, যে উভয়দেশের ভূপ্রকৃতির এই প্রভেদের জন্য উভয়দেশের কাব্যেরও প্রভেদ ঘটিয়াছে। বাংলাদেশের কাব্য বল, গান বল—সমস্তই ঐ মহান্ ভাবে পূর্ণ, তাহার মধ্যে একটি উদাসকরা ভৈরবীর বিষাদের সুর আছে। প্রকৃতিটা এত বড় যে তাহা উপভোগ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই এবং তাহার পাশে মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ হাসিকান্না অত্যন্ত ছোট হইয়া পড়িয়াছে। এ একেবারে মায়াবাদের দেশ! এখানে সবাই হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছে।

তাঁহার এই কথাটা আমার খুবই মনে লাগিয়াছিল। সত্যই তো তাই। ইংলণ্ডের প্রকৃতির মধ্যে এদেশের প্রকৃতির মত এমন শান্তিময় বৃহৎ অবকাশ কোথায়! সেখানে প্রকৃতি মানুষের অনুগামিনী সহচরী, ফিট্‌ফাট্ বেশে হাসিমুখে তাহার সঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিয়াছে। এখানে তো তাহা নয়। এখানে আলোয় আবিষ্ট করে, গন্ধে বিধুর করে, মর্ম্মরধ্বনিতে উদাস করে, এবং আকাশের সুদূর ব্যাপ্তিতে মনকে একেবারে গৃহছাড়া নিরুদ্দেশ করিয়া দেয়। দাঁড় বাহিতে বাহিতে এখানে মাঝিরা গায়,—মনমাঝি, তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পারলাম না! বড় বড় কবিরাও এখানে যা লেখেন তাও ঐ সুরেই সুর মেলায়! তাঁরাও গাহেন ঃ—

"আকাশ ছেয়ে মন-ভোলান হাসি
আমার প্রাণে বাজাল আজ বাঁশি!
লাগ্‌ল আলস পথে চলার মাঝে
হঠাৎ বাধা পড়্‌ল সকল কাজে!"

খেয়া।

ঘুরিয়া ফিরিয়া ঐ একই সুর! "হে সুদূর, আমি উদাসী!" সঙ্গীতেও দেখ, সকাল বেলার ভৈরবী বল, বিকালের পূরবী মূলতান বল, রাত্রের বেহাগ বল—সকল সুরেরই অব্যক্ত আকুতিকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে ঐ দাঁড়ায়—"হে সুদূর, আমি উদাসী!" ইউরোপের কবিতায় বা গানে ঠিক এই ভাবটি নাই। সেখানে কবিতায় যে কোথাও মহান্ ভাব ফুটে নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহা হয়ত কোন একটা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখিয়া—যেমন সমুদ্র, কি উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, কি প্রবল ঝটিকা, কি মানুষের মধ্যে কোন আশ্চর্য্য শক্তির প্রকাশ! দৃষ্টান্তস্বরূপে যেমন ধর, বায়রণের চাইল্ড হেরল্ডে সমুদ্রের উদ্দেশে যে শ্লোকগুলি আছে,—Roll on, Thou deep and dark blue ocean roll! কিম্বা ওয়ার্ডস্বার্থের সেই ওয়াই নদীর তীরে পর্ব্বতদৃশ্যের মধ্যে রচিত কবিতাটি—Five years have past—ইত্যাদি।

"Once again
Do I behold these steep and lofty cliffs
That on a wild secluded scene impress
Thoughts of more deep seclusion"
আবার হেরিনু আমি সেই মহা তুঙ্গ গিরিরাজি
বিজন আরণ্য দৃশ্যে দেয় যাহা মুদ্রিত করিয়া
সুগভীরতর কোন্ বিজনতা-রহস্য-বারতা!

কিন্তু সমস্ত ইউরোপীয় সাহিত্য ঘাঁটিলেও এমন শ্লোক কোথাও পাইবে না যে—

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় যে ঘুরে ঘুরে।
যে বাঁশীতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশীটির সুরে সুরে!

ইউরোপীয় সাহিত্যে এই অনির্ব্বচনীয় ভাবের চেয়ে সৌন্দর্য্য উপভোগের আনন্দ ও সৌন্দর্য্যমুগ্ধতার ভাব অনেক বেশি প্রবল।

কিন্তু এইখানে একটি বড় প্রশ্ন জাগে—সৌন্দর্য্যে ও মহিমায় কি কোন জাতিগত ভেদ আছে? আমাদের কবিদের মধ্যে মহিমার ভাব অধিক যখন বলিতেছ, তখন তার মানে কি এই যে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-দৃষ্টি নাই? অর্থাৎ সৌন্দর্য্যই বা তুমি কাহাকে বল এবং মহিমাই বা কাহাকে বল তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও।

ইংরাজী সৌন্দর্য্যশাস্ত্রে আমরা যাহাকে মহিমা বলিতেছি তাহাকে বলে Sublimity * আর যাহাকে সৌন্দর্য্য বলিতেছি তাহাকে বলে Beauty এবং এই দুয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে সেখানেও বিস্তর মতামতের গোলযোগ আছে।

সৌন্দর্য্য কি তাহা সংজ্ঞিত করিতে যাওয়াও যা আর গ্রীকপুরাণ-কথিত স্ফিংক্সের মুখের মধ্যে প্রবেশ করাও তাই—একই কথা। স্ফিংক্স আর কিছুই নয়, গ্রীক্ পুরাণের একটি কাল্পনিক জন্তু—অর্দ্ধেক সিংহী এবং অর্দ্ধেক মানবী। সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া পথিকদিগকে সমস্যা পূরণ করিতে দিত, যে পারিত তাহাকে যাইতে দিত এবং যে পারিত না তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিত। পৃথিবীতে যে অনেক-গুলি সমস্যা আছে যাহার মীমাংসা হয় না এবং যাহা মানুষকে গ্রাস করিয়া ফেলে,—তাহাই জ্ঞাপিত করিবার জন্য গ্রীক্‌রা এই অদ্ভুত কল্পনার অবতারণা করিয়াছিল। সে যাহাই হোক সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞা-নিরূপণও এই রকমেরই সমস্যা। তাহার বৃথা চেষ্টা না করিয়া

* Sublime শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ "মহান্" ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় না। Sublimityর প্রতিশব্দ "মহিমা" করিতে হইয়াছে, কারণ 'মহান্' হইতে বিশেষ্য 'মহত্ত্ব' কোনমতেই Sublimityর অর্থ জ্ঞাপন করে না।

এইটুকু সোজাসুজি বলা যায় যে, সৌন্দর্য্য, সত্য এবং মঙ্গল এই তিনটি মূল তত্ত্ব মানুষ জানে। সত্যকে মানুষ আবিষ্কার করে—অনেক অজ্ঞানের পাশ ছেদন করিয়া, মঙ্গলকে মানুষ অনুষ্ঠান করে নানা কর্ম্মাদিতে, এবং সৌন্দর্য্যকে শুদ্ধমাত্র অনুভব করিয়া থাকে। মোটামুটি ইহাই বলা যায়—যদিও এই তিনের মধ্যে যে যোগাযোগ নাই তাহা নহে। সুতরাং সৌন্দর্য্য বলিতে এমন বস্তু বুঝি যাহা অহেতুক এবং যাহার সঙ্গে কোন প্রয়োজনের সম্বন্ধ নাই। তাহাকে কার্য্যকারণের নিয়ম খাটাইয়া অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিতেও হয় না এবং নানা কাজে কর্ম্মে ফলাইয়া তুলিয়া মনুষ্যের প্রয়োজন সাধনে ব্যবহার করিতেও হয় না।

সৌন্দর্য্যরস যখন এইরূপ একটি স্বপ্রতিষ্ঠিত পরিপূর্ণ জিনিস তখন তাহার মধ্যে যে সকল স্বাদবৈচিত্র্য আছে, তাহারা অন্য শ্রেণীর মধ্যে কেন পড়িবে? অর্থাৎ মহিমার রসকেই বা সৌন্দর্য্যরসের বিরোধী ও বিপরীত বলিয়া বর্ণনা করিব কেন? অনেক ইংরাজ সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিৎ তাহা করিয়া থাকেন জানি—তাঁহারা বলেন একটা হচ্ছে Sublime অন্যটা Beautiful—দুটা নামই ইহাদের পরস্পরের পার্থক্য সূচিত করিতেছে। কিন্তু সে পার্থক্য কেবলমাত্র মাত্রার পার্থক্য—বস্তুগত পার্থক্য হইতে যাইবে কেন?

আমরা যে সুন্দর বলি বা চমৎকার বলি, সে কত বিভিন্ন জিনিসকে বলি এবং সকলটারই কি স্বাদের মাত্রা সমান? একটা কাপড়ের ভাল পাড়কেও চমৎকার বলি, আবার জনহীন দিগদিগন্তব্যাপী মাঠের মধ্যে সূর্য্যাস্তের প্রদীপ্ত অনলোদ্গারকেও চমৎকার বলি—কিন্তু এ দুয়ের চমৎকার্য্য কি একই? কোনটা চোখকে বা কানকে ভুলায় বলিয়া সুন্দর, কোনটা মনে একটা সুসঙ্গতির ভাবকে

জাগায় বলিয়া সুন্দর, কোনটা বা বিস্ময়ের আনন্দে অভিভূত করে বলিয়া সুন্দর! কিন্তু ইহাদের একটাকে সৌন্দর্য্যের কোটায় ফেলিয়া অন্যগুলিকে সেখান হইতে খারিজ করিয়া দিব ইহার কি মানে আছে ?

যে কবির কথা প্রবন্ধারম্ভে উল্লেখ করিলাম, আমার বেশ মনে আছে, তিনি সুন্দরকে এবং মহান্‌কে পৃথক্ কোটায় বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তাহার কারণ বলিয়াছিলেন এই যে, সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করে এবং মহিমা আমাদিগকে বিস্মিত কিম্বা উন্মনা করে। দুই ভিন্ন রসে মনকে রসায় বলিয়া ইহারা একই সৌন্দর্য্যের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না।

সাধারণ ভাবে আমি একথা মানিয়া যাইতে রাজি আছি; কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে যাহা মুগ্ধ করে তাহা কি বিস্মিত বা উন্মনা করিতে পারে না? দেখা যাক্ আমরা মুগ্ধ হই কখন? আমরা তখনি মুগ্ধ হই বলি যখন আমরা কোন একটা পদার্থের এমন একটি বাহ্য সুসঙ্গতি দেখি যাহা ইন্দ্রিয়কে তৎক্ষণাৎ পাইয়া বসে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়া মনের ভিতর মহালে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রশংসা বাণীকে সহজেই বাহির করিয়া লইয়া আসে। ফুলের দলগুলি এমনি সুন্দরভাবে সাজানো যে তৎক্ষণাৎ তাহা আমাদের চোখ্‌কে মুগ্ধ করিয়া বসে, তাহার গন্ধটি এমনি মৃদু যে আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুতন্তুতে তাহা একটি কোমল ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়। কতগুলি আবর্জ্জনাস্তূপ দেখিলে তো সেই সুসঙ্গতিটি দেখা যায় না, সুতরাং তাহা ইন্দ্রিয়কে পীড়াই দেয়। একজন দীর্ঘনাসা বা দীর্ঘকর্ণ-বিশিষ্ট লোককে অসুন্দর ঠেকে কেন? কারণ, তাঁহার চেহারায় একজায়গায় যতিঃপতন হইয়া গিয়াছে—অঙ্গের এক অংশের

সঙ্গে অন্য অংশের দিব্য সামঞ্জস্যটি নাই। শুধু যে চোখে সুসঙ্গতি দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হই তাহা নহে—চোখে বা কানে সুসঙ্গতি বোধ না হইলেও অনেক সময় ভিতরকার সুসঙ্গতি দেখিয়াও আমরা মুগ্ধ হই।

যেমন ভারতচিত্রশিল্পে অপ্সরার নৃত্যলীলার চিত্র এবং মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্যের চিত্র দুইই আছে—একটা চোখে ভাল লাগে, আর একটা শুধু চোখে ভাল লাগে নয় মনেও ভাল লাগে। সেইজন্য একটা ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালীন সুখ দিয়া বিদায় হয় এবং অন্যটা ভাবের আনন্দে চিরদিন মনকে মাতাইয়া রাখে। সুতরাং ভিতরের সুসঙ্গতি বাহিরের সুসঙ্গতি অপেক্ষাও অনেক বেশি স্থায়ী এবং স্থায়ীভাবেই তাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া থাকে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহা মুগ্ধকর তাহা কি মহান্ হইতে পারে না? দেখা যাক্ মহিমার রসটা কি রকম? অর্থাৎ আমরা মহিমার ভাবে পূর্ণ হই কখন্?

অনেকে বলেন্ যে "আকারের আয়তনের সংখ্যার বা প্রসারের বিশালতা দেখিলেই আমরা মহিমার রস আস্বাদন করি। যেমন রাত্রিকালে অগণ্যতারাখচিত আকাশ, যেমন অনন্তকালের ভাব, যেমন লক্ষ লক্ষ ভীমকায় বনস্পতিসম্পন্ন মহারণ্য, যেমন তরঙ্গিত কূলহীন অনন্ত সমুদ্র! কেবলমাত্র আকারে আয়তনে প্রকাণ্ড বলিয়াই আমরা ইহাদিগকে বলি মহান্! একটা ছোট ওষধি দেখিয়া আমাদের বিস্ময় হয় না, কিন্তু একটা বৃহৎ বনস্পতি দেখিয়া আমাদের বিস্ময় হয়। একটা পিপীলিকা দেখিয়া বিস্ময় হয় না, কিন্তু একটা হস্তী দেখিয়া বিস্ময় হয়।"*

* Bradley'র Oxford Lectures on poetry হইতে উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের অনুবাদ।

আমি স্বীকার করি যে সাধারণতঃ মহিমার ভাবকে আমরা এই আকার-আয়তনের বিশালতার সঙ্গেই সংযুক্ত করিয়া রাখি, যেমন সৌন্দর্য্যের ভাবকে আমরা ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখি। একটু আগে আমরা দেখিলাম যে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুসঙ্গতিকেই আমরা সৌন্দর্য্য বলিয়া থাকি। অথচ ভিতরের সুসঙ্গতিকে মনের শক্তির দ্বারা আবিষ্কার করিয়া লইয়া দেখিতে হয়, সুতরাং তাহা বাহ্য সুসঙ্গতি অপেক্ষা অনেক বেশি সত্য এবং স্থায়ী এবং সেই জন্যই তাহাকেই প্রকৃতপক্ষে যথার্থ সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিকীর্ত্তিত করা যাইতে পারে। সে যেমন দেখিলাম, তেমনি এখানেও কেন বাহিরের আকার-আয়তনের বিশালতাকেই মহিমা বলিব? আকার-আয়তনের স্বল্পতা ঘটিলেই কি কোন বস্তু মহিমার ভাবে আমাদের মনকে পূর্ণ করিতে পারে না? একটা কীটেরও যদি সমস্ত জীবনলীলার রহস্য আমাদের কাছে হঠাৎ উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তবে সে কি সামান্য বিস্ময়? তখন সেই কীট কি বাস্তবিকই মহান্ হয় না? মেটারলিঙ্কের "The Life of the Bee" মৌমাছির কাহিনী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কি "Soul of the hive" মৌচাকের প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রকৃতির রহস্যভবনের দ্বার খুলিয়া এক অচিন্ত্য অভাবনীয় লীলার দৃশ্য দেখেন নাই? সুতরাং যেখানেই আমরা ভিতরের এমন একটি রহস্যকে দেখিতে পাই, যাহা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখিনা, কিন্তু মনের দৃষ্টির দ্বারা দেখি, সেখানেই আমরা বিস্ময় অনুভব করি। সেই বিস্ময়ের ভাবটিই তো মহিমার ভাব। সেখানে আমরা শুধু যে মুগ্ধ হই তাহা নহে, বিস্মিতও হই। সুতরাং তখন আমরা এমন একটি সৌন্দর্য্যকে আবিষ্কার করি যাহা

হৃদয় হরণ করে বটে, কিন্তু সেই তৃপ্তিতেই বাঁধিয়া রাখে না। তাহার একটি অসীম মুক্ত রূপকেও আমাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত করিয়া দেয়।

আমার কথার উদাহরণস্বরূপে "যেতে নাহি দিব" কবিতাটি ধরা যাক্।

সেই যে একটি ছোট বালিকা তাহার পিতার কর্ম্মস্থানে যাইবার কালে বলিল, "যেতে নাহি দিব" তাহা সামান্য কথা নয়—সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে সেই কথাটির একটি করুণকাতর ক্রন্দন বাজিতেছে। সেই চারি বৎসরের কন্যাটি যেন সমস্ত পৃথিবীরই প্রতিচ্ছবি! পৃথিবীতে মৃত্যু আসিয়া সমস্তই হরণ করিয়া লইয়া যায়, তথাপি তাহার চিরজীবী প্রেম তো কোন মতেই পরাভব মানিতে চায় না! এই যে একটি ক্ষুদ্র কন্যার সামান্য দুঃখের মধ্যে সমস্ত পৃথিবীর একটি বিরহবেদনাকে অনুভব করা—ইহাই মহিমার রস। কেননা, এখানে একটি বিশেষ আবিষ্কারের আনন্দ আছে। হঠাৎ একটি ছোট ঘটনা পৃথিবীরই উপরকার একটা পর্দ্দা তুলিয়া ধরিয়াছে—দেখা গেল যে কিছুই ছোট নহে, সমস্তই সেই বিরাট বিশ্বচরাচরের সঙ্গে এক! যে বেদনা ঐ কন্যার মুখে, সেই বেদনা সমস্ত পৃথিবীর মুখে! এই সামঞ্জস্যের প্রকাণ্ড একটি আবিষ্কারের জন্য কবিতাটি এমন মহিমার ভাবে পূর্ণ হইয়াছে।

কেবলমাত্র একটা বিরাটশক্তির কাছে মানুষের পরাভবজনিত যে বিস্ময় তাহার রস খুব গভীর নহে। তাহা কতকটা আদিম যুগের মানুষের প্রকৃতির শক্তি-উপাসনার ব্যাপারে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এক্ষণে মানুষ শুধু সেই বাহ্যশক্তিকেই প্রকাণ্ড করিয়া দেখিতে পারে না। কারণ মানুষ বিজ্ঞানের দ্বারা তাহার উপরে

জয়ী হইয়া উঠিয়াছে। আমি দেখিয়াছি যে বাহ্য প্রাকৃত শক্তি না হোক্, একটা কোন শক্তির বড় প্রকাশ দেখিতে পাইলেই ইউ-রোপীয় চিত্ত সেখানেই বিস্ময়বোধ করে এবং তাহাকেই Sublime বলিয়া কীর্ত্তন করিতে চায়। এড্‌মণ্ড বার্ক তো স্পষ্টই বলিয়াছেন যে মহিমার রস একটা প্রবল শক্তির ভীতি হইতেই জন্মে। অধ্যাপক ব্রাড্‌লি, যিনি বার্কের এই মতের প্রতিবাদ করিয়াছেন, তিনিও তাঁহার এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে বাহ্য আকারের আয়তনের বিশালতা না হোক, কিন্তু কোন শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইলেই আমরা সেইখানেই মহিমার ভাব অনুভব করিয়া থাকি।

কিন্তু আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয় যে, যে-সৌন্দর্য্য আমাদিগকে একটি সুসঙ্গতি দেখাইয়া মুগ্ধ করে, তাহাকে যখনই আমরা বিশ্বব্যাপী একটি সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, তখনই আমরা বিস্ময়বোধ করি এবং সেই মুগ্ধকর সুন্দর পদার্থকে মহান্ পদার্থ বলিয়া কীর্ত্তন করি। যেমন ধরা যাক্, কীট্‌সের গ্রীসের মৃৎপাত্রের উপর কবিতাটি। মৃৎপাত্রের চারিদিকে চিত্রিত গ্রীক্‌যজ্ঞের ছবি নিশ্চয়ই মুগ্ধকর। কিন্তু যখন বলা হইতেছে ঃ—

Thou silent form! Dost tease us out of thought "As Doth Eternity"—হে নিস্তব্ধ রূপ! তুমি আমাদের চিন্তাকে বিভ্রান্ত করিয়া দাও, যেমন অনন্তকাল করিয়া থাকে!—তখন অনন্তকাল ধরিয়া যে সেই সৌন্দর্য্যময় মৃৎপাত্রের রূপটি জাগ্রত হইয়া থাকিবে, কীট্‌সের এই অনুভূতি তাহার সৌন্দর্য্যের রসকে মহিমার রসে পরিণত করিয়া দেয়। চিত্রিত মৃৎপাত্রটি যে কেবলমাত্র সুন্দর তাহা নয়, তাহা মহান্—কবি এই সত্যটি প্রচার করিলেন।

আমি এখন আমার গোড়ার কথায় যাই। প্রবন্ধারম্ভে যে বাংলাদেশের কাব্যে মহিমার ভাবের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে—তাহার অর্থ বোধ হয় এতক্ষণে বুঝা যাইতেছে। সে ভাবটি যে কেবলি উদাস-উন্মনা-ভাবব্যঞ্জক এবং তাহাতে সৌন্দর্য্যমুগ্ধতার কোন সম্ভাবনা নাই,—এমন কথা ভাবিবার কোন হেতু নাই। কারণ আমরা দেখিলাম যে, সৌন্দর্য্য ও মহিমার মধ্যে কেবল মাত্রার তারতম্যভেদ আছে কিন্তু বস্তুগত ভেদ নাই। তবে ইংরাজী কাব্যে সৌন্দর্য্যের মুগ্ধকরতার বার্ত্তা যতটা পাওয়া যায়, মহিমার বার্ত্তা ততটা পাওয়া যায় না; পক্ষান্তরে এদেশী কাব্যে মহিমার বার্ত্তা ততটা পাওয়া যায়, সৌন্দর্য্যমুগ্ধতার বার্ত্তা ততটা পাওয়া যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কোন দেশের কাব্যেই এ দুয়ের আত্যন্তিক বিচ্ছেদ ঘটে নাই। কারণ এ দুয়ের শুভ সম্মিলনের উপরেই সকল ভাল কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।

এ দেশীয় কাব্যের ন্যায় ইউরোপীয় কাব্যে প্রকৃত মহিমার রস অনেক স্থানেই প্রকাশ পাইয়াছে—তার সাক্ষী কীটসের গ্রীসান্ আর্ন—কবিতাটি। কিন্তু মহিমার রস সে দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাহিরের আকার-আয়তনের বিশালতা বা প্রবল শক্তির সঙ্গেই জড়িত হইয়া আছে, ইহা পূর্ব্বেই দেখা গেল। মহিমার রস যে বাস্তবিকই সৌন্দর্য্যের অন্তরতর লোকের মধ্যে নিগূঢ় ভাবে সঞ্চিত—সৌন্দর্য্যই যে সীমার দিক দিয়া মনোহর কিন্তু অসীমের দিক দিয়া মহান্—এই কথাটা আজিও ইউরোপীয় চিত্তে ভাল করিয়া জাগিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আকার-আয়তনের বিশালতাকে মহান্ বলিয়া কীর্ত্তন করা মানবসভ্যতার নিতান্ত একটি বাল্য সংস্কার বলিয়া আমার মনে হয়। আর সেই

ভাবে মহিমাকে দেখিতে গেলেই তাহা সৌন্দর্য্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখনই উভয়ের রসের মধ্যে মাত্রাগত নহে, শ্রেণীগত পার্থক্য অনুভূত হইয়া থাকে।

যেখানে কোন বস্তু সীমার দিক্ দিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়মনের কাছে সুসঙ্গতিপূর্ণ হইয়া ধরা দেয়, সেখানেই তাহা সুন্দর; কিন্তু যেখানে তাহা অসীমতার দিক দিয়া সকল ধরাছোঁয়ার অতীত হইয়া বিশ্ব-ব্যাপী পরিপূর্ণতায় প্রকাশ পায় সেখানেই তাহা মহান্। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ। তিনি সকলের অন্তরে আছেন, তিনি সকলের বাহিরেও আছেন। সকলের ভিতরে যেখানে সুসঙ্গতি ও সুসামঞ্জস্য মনের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়, সেইখানেই সৌন্দর্য্য এবং সেইখানেই সৌন্দর্য্যের অধীশ্বর সেই পরম সুন্দরের বিহারলোক। সকলের বাহিরে যেখানে নিঃসীম পরিপূর্ণতা বাক্যের সহিত মনকে ফিরাইয়া আনে, সেইখানে মহিমা, সেইখানে অনন্ত আনন্দ সকল সৌন্দর্য্যের সীমার বাহিরে আপনার অপরূপত্বে বিরাজমান। সকল বস্তুর মধ্যেই এই সীমা-অসীমের লীলা রহিয়াছে, সেইজন্য সকল বস্তুই সুন্দর এবং মহান্ উভয়ই—হিন্দুর রসবোধ এই কথাটি খুব গভীরভাবেই স্বীকার করিয়াছে।

মেটারলিঙ্ক

(১)

ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্য এমনি এক নূতনতর ব্যাপার, গত পনের বিশ বৎসরের মধ্যে তাহার এতই বদল হইয়া গিয়াছে, যে তাহার ভাবখানা যে কি ও তাহার ধারা যে কোন্ দিকে চলিয়াছে পরিষ্কার করিয়া তাহা দেখানো বড় শক্ত। বিশ বৎসর পূর্ব্বে সাহিত্যে এত বেশি জনতা ছিলনা; এখন শুধু লোকের ভিড় নয় ভাবের ভিড়ই তাহার চেয়ে শতগুণ অধিক। তখন সমতলে দাঁড়াইয়া উজ্জ্বল দিবালোকে গোটাকতক মাথালো মাথালো গিরিশৃঙ্গ দেখা যাইত—লোকে নীচে থাকিয়া তাহাদের উচ্চতার পরিমাপ করিত। ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্য্য, রহস্য সমস্তই সুগম্ভীর ও নিবিড় অথচ সমস্তই কি পরিষ্কার ও ভরাট্! এখন যেন পাহাড়ের শ্রেণীর মধ্যে থাকিয়া সাহিত্যকে দেখিতে হইতেছে—পর্ব্বতের পর পর্ব্বত তাহার আর অন্ত নাই। তাহাতে আবার সময় রাত্রি। যদিও দিব্য জ্যোৎস্না রহিয়াছে, তথাপি কিছুই স্পষ্ট নয়—পাহাড়ে উপত্যকায় আলোয় ছায়ায় জড়াইয়া এক পাহাড়কেই পাঁচ পাহাড় এবং পাঁচ পাহাড়কেই পঁচিশ পাহাড় বলিয়া মনে হয়। এক ভাবের মধ্যে নানাভাবের মিশল—তাহার কোথায় যে সুরু আর কোথায় যে শেষ, তাহার কি যে নিহিতার্থ আর কি যে অভিব্যঞ্জনা তাহা অনুসরণ করিতে যাওয়া যেন জলের উপর চাঁদের প্রতিবিম্বকে ধরিতে যাইবার মতো। ধরিতে গেলেই তাহা পালায়। সুতরাং এই পর্ব্বতলোকের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলে ঘোরাটাই হয়

মাত্র—কোন্‌টা যে কি তাহা জানা যায় না এবং কোনো ভাবের পরিষ্কার পরিমাপ হয় না। এ যেন স্বপ্নরাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবার মতো।

এত অল্প সময়ের মধ্যে সাহিত্যের এমনতর পরিবর্ত্তনকে অভাবনীয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু অভাবনীয় বলি কেন? এ যুগের মানুষ যে সম্পূর্ণরূপে এক নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছে। সে ছিল ক্ষুদ্রদেশে ও ক্ষুদ্রকালে নানা কৌলিক ও দৈশিক সংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ। হঠাৎ সে বিশাল জগতে ও ব্যাপ্ত কালের মধ্যে ছাড়া পাইয়াছে এবং নূতন জ্ঞান, নূতন ভাব ও নূতন অনুভূতি সকল তাহার পুরাতন সংস্কারের স্থানে আপনাদের দখল জানাইয়াছে। ভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত থিতাইয়া সংস্কারের মত সুদৃঢ় সুপরিণত ও সুনিশ্চিত না হইলে সাহিত্যে কি তাহাকে রূপ দান করা যায়? যাহা ক্রমাগতই পরিবর্ত্তনের মুখে আবর্ত্তিত হইতেছে, যাহা কোন স্থায়ী আকার লাভ করে নাই, নানা সঙ্গতিসূত্রে নানা জিনিসের সহিত বাঁধিয়া যায় নাই, তাহাকে সাহিত্যে চিত্রিত করা একপ্রকার অসম্ভব বলিলেই হয়। কিন্তু সেই অসম্ভব কার্য্যেই আধুনিক সাহিত্য হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সেইজন্য পূর্ব্বের সঙ্গে তাহার বিচ্ছেদ এরূপ আত্যন্তিক হইয়াছে।

"আধুনিক কালে আমাদের সংস্কার ভাব ও অনুভাব সকলের মধ্যে যে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায় তদপেক্ষা বিস্ময়কর আর কিছুই নাই। এই বিশৃঙ্খলায় আমরা এমন কতগুলি অনুভাব দেখিতে পাই,—যাহারা বাস্তবিকই এখনকার কালের জ্ঞানানুমোদিত ভাবের একেবারেই অনুগামী নহে—যেমন ধর, সুনির্দ্দিষ্ট, ব্যক্তিগত, সীমাবদ্ধ ঈশ্বরের ধারণা। আবার কতগুলি

অনুভূতি আছে যেগুলি অর্দ্ধেক আইডিয়ার আকার লাভ করিয়াছে—যেমন ধর নিয়তির সম্বন্ধীয় ধারণা। আবার আমরা এমন কতগুলি ভাব দেখিতে পাই যাহারা ক্রমেই অনুভূতির ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে—যেমন প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন, অভিব্যক্তি, বংশের বা জাতির ইচ্ছা ইত্যাদি। আরও অনেক ভাব আছে, কিন্তু সেগুলি এখনও মানুষের হৃদয়ের মধ্যে স্থান পায় নাই, এখনও অনিশ্চিত ও বিক্ষিপ্ত রহিয়া গিয়াছে।"

উপরে যে কথাগুলি উদ্ধৃত করিলাম তাহা একজন আধুনিক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের লেখার অনুবাদ। সাহিত্যের যে নব পরিবর্ত্তনের কারণ আমরা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাঁহার এই উদ্ধৃত রচনা তাহা সমর্থন করে। যে "বিশৃঙ্খলা"র কথা তিনি বলিতেছেন, তাহাকেই তিনি তাঁহার সাহিত্যে শৃঙ্খলায় পরিণত করিবার জন্ত উদ্যোগী। আমি আধুনিক সাহিত্যজগতকে এক গিরিমালার সঙ্গে তুলনা করিয়াছি; ইনি তাহারি মধ্যবর্ত্তী সর্ব্বোচ্চ গিরি—শুভ্র তুষারের রাজমুকুট ইঁহারি মস্তকে শোভা পাইতেছে। এবং জ্যোৎস্না নিশীথে এই গিরিশ্রেণীর মধ্যে আলোছায়ার উচ্চতার নীচতার জড়িতভাবের যে বিভ্রমের কথা বলিয়াছি, ইঁহার পাদদেশে তাহার কিছুকিছু পরিচয় পাইলেও যতই ঊর্দ্ধে উত্থিত হইব, ততই হরজটায় শোভিত চন্দ্রকলার ন্যায় রহস্যের অন্তর্নিহিত সুস্পষ্ট সত্য ও সৌন্দর্য্য আমাদের নয়নসম্মুখে উদ্ভাসিত হইবে। এই আধুনিক লেখকটির নাম মেটারলিঙ্ক। আজ ইঁহারি রচনা ও বাণী সম্বন্ধে আমি আলোচনা করিতে চাই।

মেটারলিঙ্ক প্রধানত নাট্যকার বলিয়া খ্যাত। কিন্তু তাঁহার নাটকগুলি এমনি ছায়া-ছায়া স্বপ্নময়, এমনি বাষ্পের দ্বারা তৈরি

লোকের মত যে কে বলিবে তাহার ভিতরে কোন গভীর তাৎপর্য্য বিরাজ করিতেছে! "রঙ্গমল্লী"র গ্রন্থকার কবি সত্যেন্দ্র ইঁহার একটি নাটক—The sightlessএর (দৃষ্টিহারা) অনুবাদ করিয়াছেন। দশ বৎসরের পূর্ব্বে যখন প্রথম সেই নাটকটি পাঠ করিয়াছিলাম, তখন তাহার ভিতরে যে কোন অর্থ আছে তাহা মনেই হয় নাই। তারপর কিছুকাল পরে পুনরায় একবার পাঠ করি, তখন যে অর্থ মনে হইয়াছিল অধুনা হেন্‌রিরোজের সমালোচনা পড়িয়া দেখিতেছি তাহা একেবারেই ঠিক অর্থ নহে। "দৃষ্টিহারা" মেটারলিঙ্কের অল্প বয়সের রচনা, কিন্তু অধিক বয়সে তিনি যে সকল নাটক লিখিয়াছেন—যেমন 'ব্লুবার্ড'—তাহাও যে পরিষ্কার অর্থজ্ঞাপক হইয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না। সেইজন্য মেটারলিঙ্ককে "মিষ্টিক" অর্থাৎ দুর্ব্বোধ জাতীয় লেখক, এই নাম দেওয়া হইয়াছে।

আধুনিক সাহিত্যরথিগণ প্রায়ই সব্যসাচী—তাঁহারা একই সময়ে গদ্য ও পদ্য এই উভয় রচনার তীর চালনা করিতে সুনিপুণ। সেইজন্য তাঁহাদিগকে আর সমালোচকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের টীকা লেখেন, নিজেরাই নিজেদের রস বিশ্লেষণ করিয়া দেখান। যখন নাটক লেখেন বা কবিতা লেখেন, তখন তাঁহারা কালিদাস; যখন প্রবন্ধ লেখেন বা তত্ত্বালোচনা করেন তখন তাঁহারা মল্লিনাথ। কবিতাতে বা নাটকে যাহা অখণ্ড ও অনির্ব্বচনীয় রসে প্রকাশ করেন, সেই একই জিনিস আবার গদ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া তত্ত্বের আকারে প্রকাশ করেন। উভয়ক্ষেত্রে বস্তু স্বরূপতঃ একই, প্রকাশ কেবল বিভিন্ন। এই একটি আশ্চর্য্য সুবিধা আধুনিক লেখকগণের ঘটিয়াছে বলিয়া তাঁহাদিগকে বুঝা দুঃসাধ্য ব্যাপার হয় নাই। তাঁহারা

আপনারাই আপনাদিগের সত্য ও সৌন্দর্য্য অনেকটা পরিমাণে উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন।

মেটারলিঙ্কের নাটক পাঠের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা তাঁহার গদ্যগ্রন্থসকল পাঠ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছেন, মেটারলিঙ্ককে তাঁহারাই ঠিকমত ধরিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। তাঁহার "Wisdom and Destiny" বা "Buried Temple" পড়িলে তাঁহার যে-কোন নাটকের ভিতরকার তাৎপর্য্যের রত্নাগারের চাবিটি পাওয়া যায়। দেখা যায় যে মেটারলিঙ্কের নাটকগুলি অধ্যাত্মজীবনের বিচিত্র-নিগূঢ় অবস্থা ও অভিজ্ঞতার বিবৃতি। যে সকল সমস্যা ও বাধা এই জীবনের প্রকাশকে অবরুদ্ধ করে, যে সকল পরীক্ষা ইহার সম্মুখে উপস্থিত হয় ও তাহাদিগকে অতিক্রম করিবার জন্য যে সংগ্রাম জাগে, এবং পরিণামে যে আনন্দ, শান্তি ও পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি লাভ হয়—মেটারলিঙ্ক সেই সকল অবস্থা ও অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এক অদ্ভুত নাট্যকলার ভিতর দিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার নাট্যে কোন বাহিরের ঘটনা নাই, বিশেষ কোন কাহিনী নাই বলিয়া সাধারণ লোকের ঔৎসুক্য জন্মেনা। বিশেষ অনুধাবন করিয়া না দেখিলে যে গভীরতর অধ্যাত্ম-জীবনের নিগূঢ় সকল অভিজ্ঞতা ও অবস্থার বিবৃতি ইহাতে আছে বলিতেছি তাহাও আবিষ্কার করা কঠিন হয়। তবে যাঁহারা মেটার-লিঙ্কের গদ্যরচনা পাঠ করিয়া ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার নাট্য আলো-চনা করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা আর অলস ও উদাসীন ভাবে ইহার পাতা উল্টাইতে পারেন না। তাঁহারা দেখেন প্রত্যেক কথাটি অর্থপূর্ণ। তাঁহারা এই নাট্যে একটা চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের ঔৎসুক্যও সেই সঙ্গে বর্দ্ধিত

হইতে থাকে। অবশেষে যখন পরিণামে আসিয়া পৌঁছান যায় তখন অঙ্কে অঙ্কে যে সকল সূক্ষ্ম ও নিগূঢ় ভাবের ঘাতপ্রতিঘাত অল্পে অল্পে জমিয়া উঠিয়াছে তাহাদিগকে এক চূড়ান্ত জায়গায় আসিয়া সমাপ্ত হইতে দেখা যায়। তখন কে বলিবে যে, কোন ঘটনাবহুল নাটকের অপেক্ষা এই শ্রেণীর নাটক কোন অংশে হীন।

মেটারলিঙ্কের কোন রচনার পরিচয় দিবার পূর্ব্বে প্রথমে দেখা যাক্ তাঁহার বিশেষ বাণীটি কি। তিনি এক জায়গায় লিখিয়াছেন :—"আমরা যাহা জানি যদি তাহারি দ্বারা আপনাদিগকে বেষ্টিত করিয়া রাখিতাম; অজ্ঞাত অপেক্ষা জ্ঞাত লোক অধিক মূল্যবান—এই বিশ্বাস যদি আমাদের মনে মনে থাকিত তবে আমাদের জীবনের তাৎপর্য্য কতই সামান্য হইত। এই যে একটি অজ্ঞাতের চেতনার মধ্যে আমরা নিরত বাস করি ইহাই আমাদের জীবনকে অর্থযুক্ত করিয়াছে।" আমাদের জীবনকে ঘিরিয়া যে একটি অজানা রহস্য বিরাজমান, ইহাই মেটারলিঙ্কের আসল বাণী। শুধু তাহাই নয়, মেটারলিঙ্ক মনে করেন যে এই কথাটিই এ যুগের সকলের চেয়ে বড় কথা—সকল কথার অন্তর্নিহিত কথা। দেখা যাক্ এই অজ্ঞাত রহস্য বলিতে তিনি কি বুঝিয়াছেন এবং তাঁহার নাটকে ইহাকে তিনি কেমন করিয়া উদ্ঘাটিত করিয়াছেন।

মেটারলিঙ্ক যে একজন প্রকৃতিতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি—জানি না সে কথাটি আমার পাঠকপাঠিকাগণ সকলেই অবগত আছেন কি না। তাঁহার একটি পরম সুন্দর পুস্তক আছে, তাহার নাম "মৌমাছির জীবন"(The Life of the Bee)। প্রায় বিংশতিবৎসর কিম্বা তাহারো অধিক কাল হইবে, তিনি এই মৌমাছি জীবটিকে বিশেষ আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন। ইহার প্রকৃতির

যে সকল আশ্চর্য্য ও গোপন দিক্ তিনি দেখিতে পাইয়াছেন তাহা পড়িলে মনে হয় যেন পৃথিবীমাতার শ্যামল প্রাসাদের এক অনাবিষ্কৃত পুরী হঠাৎ তাঁহার নয়ন সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে! তাহা এক নূতন "রাণীর" দেশ—সেখানকার এক নূতন ইতিহাস! কবি যেন আলা-দীনের প্রদীপ খানি হাতে পাইয়াছেন—দ্বারের পর দ্বার খুলিয়া যাইতেছে এবং নব নব বিস্ময় আবির্ভূত হইতেছে। পৃথিবীর বুকের ভিতরকার এমন সুমধুর রূপকথা আর কোথাও পড়িয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না।

সেই জন্য যখন মেটারলিঙ্ক জীবনের চারিদিক ঘিরিয়া এক অজানা রহস্য বিরাজ করিতেছে এই কথাটি বলেন, তখন তাঁহার সেই কথা-টিকে ভাবকুহেলিকা মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। কেবল "মৌমাছি"র তত্ত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার কথায় সত্য আছে ও তাহা নির্ভরযোগ্য বলিতেছি তাহা নহে। এ যুগে এমন আর দ্বিতীয় কোন সাহিত্যিকের নাম আমার মনে পড়ে না যিনি মেটারলিঙ্কের মত বিজ্ঞানের সকল প্রণালী ও ফলা-ফলকে এমন নিশ্চিন্ত সাহসের সহিত সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মেটারলিঙ্কের নাটক পড়িয়া যাহারা তাঁহাকে "মিষ্টিক" বলে, তাঁহার গদ্য পাঠ করিয়া ও তাঁহার ভিতরে গভীরতর রূপে প্রবেশ করিলে তাহারা যদি বা সে মত পরিবর্ত্তন না করে, অন্তত "মিষ্টিক" কথাটার ললাটে "বৈজ্ঞানিক" বিশেষণটা নিশ্চয়ই জুড়িয়া দিতে বাধ্য হইবে।

বিজ্ঞানের আলোচনায় অধুনা আমাদের জীবনের সকল বিভাগে একটা বড় পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে বলিয়া মেটারলিঙ্ক এক নিমেষের জন্যও ভীত নহেন। তিনি বলেন, মানুষ এতদিন পর্য্যন্ত যে অনন্তের উপাসনা করিয়াছে, সে কেমন অনন্ত? তাহা এক

না-যায়-ধরা না-যায়-ছোঁওয়া সকলের অতীত সত্তা আর তাহার জন্য বুদ্ধিকে অপমানিত করিয়া ও প্রকৃতিকে খর্ব্ব করিয়া দুমড়ান কাগজের গোলার মত জীবনটাকে মানুষ ক্রমাগতই তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়াছে। মনে করিয়াছে জীবনটাকে যত সংক্ষিপ্ত করা যাইবে, সেই কাল্পনিক অনন্ত বুঝি ততই প্রসার লাভ করিবে। এই যে অনন্তকে পাইবার যত ভ্রান্ত প্রণালী—প্রাকৃতের চেয়ে অতি-প্রাকৃতের উপর অধিকতর বিশ্বাস—বৈজ্ঞানিক যুগে যদি ইহা ভাঙ্গিয়া গিয়া থাকে তবে খেদ কিসের! অমনি ইহাতে মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া যাইবে, রহস্যবোধ একেবারে দূর হইবে এমন মনে করিবার কোন হেতু আছে কি? মেটারলিঙ্ক বলেন, "আমাদের অজ্ঞতার পূর্ব্বে যে রহস্য আমাদের কাছে দেখা দিয়াছিল এবং জ্ঞানলাভের পরে যাহা পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছে—এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট বিদ্যমান।" তিনি বলেন রহস্য তো কখনই অন্তর্হিত হইবার নহে—তাহা স্থান পরিবর্ত্তন করে মাত্র; জ্ঞানের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে তাহারও নবতর রূপ লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব্বকালে মানুষ রহস্যের সম্মুখীন হইতে ভীত হইত, তাহাকে কেমন একটা দূর, আকস্মিক, ও অদ্ভুত জিনিষ মনে করিত। তাহা যেন দেবতার মত অপরিমেয় স্থির ও গম্ভীর—আমাদের জীবনের সঙ্গে তাহার বিশেষ যোগ নাই, আমাদের কল্পনা তাহাকে নব নব রাগে রঞ্জিত করিতে পারে না—তাহা স্থিত, অচঞ্চল, চিরন্তন। রহস্যের এই স্থিতিশীল ভাব পূর্ব্বকালের সকল ধর্ম্মের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু এই ভাব কি চিরকাল মানুষের মনের উপর সমান আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে? কিছুকাল পরে বিশ্বরহস্যের প্রতিরূপ এই স্থিতিশীল দেবতার দল চিরনিদ্রায়

নিদ্রিত হইয়া বিস্মৃতির কোন্ অতল গভীরতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে দেখা যায়! অথচ বিজ্ঞান যখন রহস্যকে পুনরায় সোনার কাঠি স্পর্শ করিয়া জাগায়, তখন দেখিতে পাই তাহার রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে রহস্য পূর্ব্বে স্থিতিশীল, ভয়ের দ্বারা দূরনিহিত, ও আকস্মিক ছিল—তাহা এখন জীবন্ত ও সচল, তাহা এখন আত্মীয় ও নিকট, তাহার কিছুই আকস্মিক নহে, তাহা সমস্ত জীবনকে ছাইয়া আছে। অনন্ত যদি অন্তবিশিষ্টের ভিতরে না দেখা দেন, জীবনের সকল অংশে যদি তাঁহার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ না হয়, তবে সেই সকলের অতীত, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডছাড়া কাল্পনিক অনন্ত লইয়া মানুষের লাভ কি?

(২)

মেটারলিঙ্কের "দৃষ্টিহারা" একটি ক্ষুদ্র নাটিকা—কবির অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের রচনা। নাট্যের পাত্রপাত্রী সকলেই অন্ধ এবং দৃশ্য একটি অরণ্যময় দ্বীপের মধ্যে। সময় মধ্যরাত্রি। অন্ধেরা একটা মঠ হইতে আসিয়াছে, একজন পুরোহিত তাহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিতেছিলেন—হঠাৎ অন্ধেরা আর তাহার সাড়া পায় না। তাহারা জানিতে পারে নাই যে পুরোহিত তাহাদের মধ্যেই মরিয়া পড়িয়া আছেন।

আধুনিক যুগে মানুষ যে কি ভীষণ ধর্ম্মসঙ্কটের মধ্যে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—নাট্যটি রূপকচ্ছলে তাহাই প্রদর্শন করিতেছে। ইউরোপে প্রচলিত চার্চ্চের ধর্ম্ম মানুষকে 'দৃষ্টিহারা' করিয়াছে এবং ধর্ম্মের চিরকালের আশ্রয় হইতে দূর করিয়া নূতন পথে নূতন সত্যের সন্ধানে বাহির করিয়া দিয়াছে। প্রাচীন পুরোহিতই এই অন্ধদলের পথপ্রদর্শকের স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, তিনি জানিতেন

না যে তাঁহার শক্তি নিঃশেষিতপ্রায়! নূতন পথে যাত্রায় বাহির হইয়াই তিনি মারা গিয়াছেন; অথচ দৃষ্টিহারার দল তাহা জানিতেও পারে নাই। তাহারা কাহারও সাড়া না পাইয়া ভীত হইয়া পড়িয়াছে। দূরে সমুদ্রের ধ্বনি—অজ্ঞাত রহস্যের সুর—তাহাদের কর্ণে পৌঁছিতেছে—তাহাদের জীবন-দ্বীপের চতুর্দ্দিকেই এক অনন্ত অনাবিষ্কৃত রহস্য। তাহাদের মধ্যে একজন বলিল যে সেই অজানা অন্ধকার জলরাশির মধ্যে একটি বাতিঘর দীপ্তি দিতেছে। অর্থাৎ সংশয়ের অন্ধকারের মধ্যেই স্থির প্রত্যয় ধ্রুবদীপ্তিতে জ্বলিতেছে। এখন হইতে আর কোন ব্যক্তি বা মত পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিবে না, হৃদ্‌স্থিত সহজ জ্ঞানই তাহাদিগকে অসীম অন্ধকারের মধ্যে আলোকে লইয়া যাইবে।

পুরোহিতের আকস্মিক অন্তর্ধান সম্বন্ধে অন্ধদের কথায় বার্ত্তায় একটি কথা বেশ স্পষ্ট হইল যে পুরোহিত যতই নবলব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহার প্রচলিত ধর্ম্মকে সুসঙ্গত করিতে অসমর্থ হইতেছিলেন, ততই মানুষের হৃদয়ের উপর অধিকার বিস্তার করিবার দিকে তাঁহার আগ্রহাতিশয্য লক্ষিত হইতেছিল। পুরুষের অপেক্ষা এইজন্য স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে অধিক অনুসরণ করিত। এই একটি ইঙ্গিতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে মেটারলিঙ্ক কেবলমাত্র হৃদয়াবেগের উপর যে ধর্ম্মের প্রধান নির্ভর সেই ধর্ম্মকে কতই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। বস্তুত এ যুগে যে ধর্ম্মের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা এমন প্রবল আকারে দেখা দিয়াছে, তাহার প্রধান কারণই এই যে মানুষের ধর্ম্মবোধের ও নূতন লব্ধ জ্ঞানের মধ্যে সৌসামঞ্জস্য হইতেছে না। জ্ঞান যতই অগ্রসর হইতেছে ধর্ম্মবোধ ততই সঙ্কুচিত হইয়া অন্ধ সংস্কারকে প্রাণপণ বলে আঁকড়িয়া ধরিতে চাহিতেছে।

অতএব যদি শাস্ত্র যায়, গুরু যায়, তবে কি মানুষের সমস্তই গেল—তাহার ধর্ম্মবোধ কি বিলুপ্ত হইতে বাধ্য হইবে? না—যে আত্ম-প্রত্যয় (intuition) ও সহজাত সংস্কার (instinct) তাহার অন্তরের অন্তরে বিরাজমান তাহারি উপর প্রধান নির্ভর স্থাপন করিতে হইবে। ইহাই মেটারলিঙ্কের সকল রচনার প্রধান বক্তব্য। ইহাকে ভাব-কুহেলিকা বলিলে জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের মিলনের কোন কালেই সম্ভাবনা দেখি না।

তাই "দৃষ্টিহারা" নাট্যে যখন অন্ধগণ ভীত হইয়া কলরব করিতেছে এবং সেই গহন অরণ্য হইতে ও সুতীব্র শীত হইতে কখনো তাহাদের উদ্ধার হইবে কি না ইহা ভাবিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে, সেই সময়ে সহসা একটি কুকুর আসিয়া উপস্থিত হইল! সে কুকুর যে আদিম সহজাত সংস্কারের প্রতিরূপ! সেই প্রথম জানিতে পারিল যে পুরোহিত মৃত। তার পরেই পদধ্বনি শোনা গেল! এক উন্মাদিনী অন্ধ স্ত্রীলোকের কোলের শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল এবং পদধ্বনির অভিমুখে সেই স্ত্রীলোক তাহাকে লইয়া ছুটিল। সে কিসের পদধ্বনি? নূতন আশা ও বিশ্বাসের আগমনধ্বনি! শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ সরলতা না থাকিলে কেহই সে পদধ্বনি শ্রুত হইবে না—বিজ্ঞ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ তাহা কেমন করিয়া শুনিবে?

মেটারলিঙ্ককে অনেকে তত্ত্বদর্শী আখ্যা দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি যে দর্শনশাস্ত্রের নিকটে বিশেষ ভাবে ঋণী এরূপ কোন পরিচয় তাঁহার গ্রন্থসমূহে পাওয়া যায় না। তবে মানুষের হৃদ্‌স্থিত সহজ প্রজ্ঞা ও আদিম জৈব সংস্কার সকল যে জীবনের রহস্য নিরূপণে প্রকৃত সহায়—মেটারলিঙ্কের এই প্রকারের মতামতের সঙ্গে আধুনিক

কোন কোন দার্শনিকের মতামতের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়।

মেটারলিঙ্ক বিশ্বাস করেন যে আমাদের মধ্যে দুই প্রকারের বুদ্ধি পাশাপাশি অবস্থান করিতেছে। এক বুদ্ধি ব্যক্তিমাত্রকে (Individual) আশ্রয় করিয়া আছে, আর এক বুদ্ধি ব্যক্তি যাহার অন্তর্ভুক্ত সেই বিশেষ জীবশ্রেণীকে (Species) আশ্রয় করিয়া আছে। একটাকে আমরা বলি বুদ্ধি বা ধীশক্তি (Reason) ও অন্যটাকে বলি সহজাত সংস্কার(Instinct)। এই উভয় প্রকারের বুদ্ধিকে মানুষের এক্ষণে ব্যবহারে প্রয়োগ করা প্রয়োজন হইয়াছে। যুক্তিমূলক বুদ্ধিকে সহজাত সংস্কারের মত সহজ ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে এবং সহজাত সংস্কারকে যুক্তিমূলক বুদ্ধির ন্যায় সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে হইবে। মেটারলিঙ্ক বারম্বার বলিয়াছেন যে, কোন জিনিসকে যতক্ষণ না আমাদের ভিতরে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়া লওয়া যায় ততক্ষণ তাহাকে আমরা বুঝি এ কথা বলিতে পারি না। অর্থাৎ যতক্ষণ না বুদ্ধি একেবারে সংস্কারের মত সহজ হইয়া যায়, ততক্ষণ আমরা কিছুই বুঝি না।

এ পর্য্যন্ত মেটারলিঙ্কের বাণীর যে ব্যাখ্যাকার্য্য করিলাম, তাহাতে এইটুকু কথাই মনে হয় যে মেটারলিঙ্ক কতগুলি হালের বৈজ্ঞানিক ভাবকে তাঁহার বলিষ্ঠ কল্পনার দ্বারা ঘোরালো করিয়া বিশ্বরহস্যকে একরকম করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি যে রহস্যের চাবি খুলিয়া দিয়া তাহাকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখাইতেছেন তাহা নহে, তিনি তাঁহার কল্পচ্ছবিগুলির মধ্য দিয়া, নানা বিগ্রহের মধ্য দিয়া রহস্যের আভাসমাত্র জাগাইয়া তুলিতেছেন। আসলে তিনি অন্তরে বৈজ্ঞানিক, কিন্তু মনে হয় যেন তিনি অতীন্দ্রিয়

লোকের দ্রষ্টা। সেই জন্য কেহ বা তাঁহাকে "মিষ্টিক" বলিয়া জানে, কেহ বা জানে বৈজ্ঞানিক বলিয়া—বাস্তবিক এ দুয়েরি সম্মিলন এক মেটারলিঙ্কেই দেখা যায়।

(৩)

কিন্তু তাঁহার শেষ বয়সে মেটারলিঙ্ক এমন এক জায়গায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যেখানে পূর্ব্বে তিনি কোনদিন যাইবেন বলিয়া কল্পনাও করেন নাই। তিনি রহস্যের একেবারে পারে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সমস্ত নিখিল সত্য তাঁহার কাছে পরম আনন্দ ও পরম সৌন্দর্য্য হইয়া প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে সেই তাঁহার হৃদ্‌স্থিত সহজ প্রজ্ঞা তাঁহাকে একেবারে বিশ্বের মর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়াছে—এখন তাঁহার বিজ্ঞানের দরকার নাই, কারণ তিনি পরশপাথর পাইয়াছেন।

মেটারলিঙ্ক লিখিতেছেন, "জীবনের পথে যতই আমরা ভ্রমণ করি, ততই অত্যন্ত সাধারণ এবং অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থসকল ও জীবনের ঘটনাগুলির সত্যতা, সৌন্দর্য্য এবং গভীরতায় আমাদের বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।"

অত্যন্ত সাধারণ এবং অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থসকল এবং জীবনের ঘটনাগুলি যে সত্য ও সুন্দর ও গভীর—এই বোধটি মেটারলিঙ্কের মধ্যে কিরূপ প্রবল তাহা তাঁহার সেই পরম আশ্চর্য্য 'ব্লুবার্ড' নামক নাটকটি পাঠ করিলেই প্রতীতি হইবে। বস্তুত ঐ নাট্যের মধ্যে অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থগুলির এবং জীবনের সামান্য ঘটনাগুলির 'সত্যতা, সৌন্দর্য্য ও গভীরতা'কে সকলের চেতনার মধ্যে জাজ্জ্বল্যমান করিয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে।

মেটারলিঙ্ক এক স্থানে লিখিয়াছেন, "যখন কোন একটা প্রবল

প্রবৃত্তির আবেগ আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসে, তখনই আমাদের জীবন খুব জাগ্রত ও সত্য হইয়া উঠে, এ কথা কল্পনা করা কি মানুষের একটা প্রাচীন ভ্রম মাত্র নয়? কল্পনা কর, একজন বৃদ্ধলোক আরাম কেদারায় বসিয়া আছে—তাহার ঘরের মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে সকল অনাদি নিয়ম কাজ করিয়া চলিয়াছে সে অচেতন ভাবে যেন সে সমস্তই বুঝিতে পারিতেছে। সে না বুঝিয়াও যেন দ্বার-বাতায়নের নিস্তব্ধতা ও আলোকের ক্রতস্বর কিরূপ তাহা বুঝিতে পারিতেছে—তাহার আত্মা এবং ধ্রুব নিয়তির নিকটে তাহার মস্তক নত করিতেছে। সে জানে না যে জগতের সকল শক্তি ভৃত্যের মত সম্মিলিত হইয়া তাহারি ঘরে নিয়ত প্রহরায় নিযুক্ত।—সে সন্দেহ মাত্র করে না যে, যে ক্ষুদ্র টেবিলটির উপর সে ঝুঁকিয়া আছে স্বয়ং রবিদেব তাহারি সন্মুখস্থ খণ্ডাকাশে সমুদিত এবং তাহার চক্ষুর নিমীলন বা চিন্তার উদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে আকাশের প্রত্যেক গ্রহতারকার গোপননিগূঢ় যোগ রহিয়াছে।

এই যে নিশ্চল অসাড় একটি বৃদ্ধ—আমার বিশ্বাস যে বাস্তবিক পক্ষে এই বৃদ্ধের জীবন সুগভীর ও বিশ্বব্যাপক। যে প্রণয়ী তাহার প্রিয় নারীকে হত্যা করিয়াছে বা যে যোদ্ধা যুদ্ধজয় করিয়াছে তদপেক্ষা ইহার জীবনের গভীরতা ও ব্যাপকতা যে কত বেশি তাহা বলিতে পারি না।”

মেটারলিঙ্ক এইজন্য কখনই বীর চরিত্র, বা প্রবল হৃদয়াবেগ, বা অত্যাশ্চর্য্য অদ্ভুত কোন ঘটনা তাঁহার নাটকের মধ্যে উপস্থিত করেন না। তাঁহার “দৃষ্টিহারা” নাট্যে যেমন, তাঁহার এই “নীলপাখী” নাট্যেও তেমনি—তিনি একেবারেই কোন নাটকীয় প্রথার (convention) ধার ধারেন নাই। “দৃষ্টিহারা” নাট্যে শেষ কালে

যেমন তিনি দেখাইলেন যে নব আশা ও বিশ্বাসের পদধ্বনি শিশুই প্রথম শ্রবণ করিতে সমর্থ হইল—এখানেও সেইরূপ বিশ্বের প্রকৃত আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের রহস্য তাঁহার নাট্যের প্রধান নায়ক এক কাঠুরিয়াবালকের নিকটেই উদ্‌ঘাটিত হইল। এ নাট্যটিও বিগ্রহরূপী (Symbolical) নাট্য। "নীলপাখী" আর কিছুই নয়—সে সুখের বিগ্রহ। মনে হয় যেন সে সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু তাহাকে ধরিতে গেলেই সে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় বা মরিয়া যায়। সে অতীতে আছে, সে বর্ত্তমানে আছে, সে ভবিষ্যতে আছে। সে স্মৃতির মধ্যে ভরিয়া আছে, সে সকল রহস্যের মধ্যে লুকাইয়া আছে, সে সকল জীবন ও জীবনের অভিব্যক্তির ইতিহাসের পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ডুবিয়া আছে, সে কত সুখ ও আনন্দের মধ্যে চমকিয়া আছে, সে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত হইয়া আছে। কিন্তু তাহাকে মানুষ সকল স্থানেই অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে, তবু কি সেই কল্পধেনু মিলিল? ফাঁকি, সকল জায়গাতেই ফাঁকি! কিন্তু না। নীলপাখী পাওয়া যাক্ বা না যাক্ কিম্বা পাইলেও তাহাকে হারাইতে হউক্ বা না হউক্—এটা ঠিক্—যে সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া চকিতের মতও একবার দেখিতে পাইলে আর ভাবনা নাই। যে সর্ব্বত্র আছে তাহাকে কি আর একটি জায়গায় বাঁধা যায়? দীর্ঘ ভ্রমণান্তে তাই এই কথাই বলিতে হয়, যে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য, সর্ব্বত্রই আনন্দ—সেই নীলপাখী সর্ব্বত্রই আছে। যে পৃথিবীতে আমরা জন্মিয়াছি তাহা "সব পেয়েছির দেশ"।

এমন করিয়া নাটকটির পরিচয় দিলে কোন পরিচয়ই পাওয়া হইবে না। আমি এমন আশ্চর্য্য নাট্য পড়ি নাই—মানুষ যে তাহার গভীরতম সূক্ষ্মতম অভিজ্ঞতার কথাগুলি এমন রূপকের

আকারে ছবির মত করিয়া ধরিতে পারে তাহা আমি কোন দিন এ গ্রন্থ না পড়িলে ধারণাও করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ। যে সকল ভাব ও অনুভাব ছায়ার মত আসে যায় ও মিলায়, যাহারা স্বপ্নের মত জীবনের প্রাসাদবলভিকায় সন্ধ্যার পাখীর মত পাখা ঝটপট্ করিয়া উড়িয়া বেড়ায় মাত্র—তাহাদিগের ছায়াকে যে এমন নিপুণ বয়নে বুনিয়া তোলা যায়—ইহা আশ্চর্য্য! আমার মনে হয় এ নাটকটি আধুনিক যুগের সৌন্দর্য্য-তত্ত্বের এক মহা শাস্ত্রবিশেষ।

এইবার নাটকের বিশদ পরিচয়দানে প্রবৃত্ত হই।

(৪)

নাটকের আরম্ভেই প্রথম অঙ্কে এক কাঠুরিয়ার গৃহে তাহার অল্পবয়স্ক পুত্র এবং কন্যা—টিল্‌টিল্ ও মাইটিল্—খৃষ্টমাসের পূর্ব্বরাত্রে হঠাৎ নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখে ঘরে দীপ জ্বলিতেছে—জানালার ঝরকা দিয়া বাহিরের রাজপথের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। কাল খৃষ্টমাসের উৎসব দিন। ধনিসন্তানেরা শকটে করিয়া চলিয়াছে—কত আলো, কত খেলনা, কত চমৎকার চমৎকার ভোজ্য পদার্থ বিপণিতে বিপণিতে সাজানো রহিয়াছে। কিন্তু হায়, সে সমস্তই ধনিসন্তানদিগের ভোগের জন্য, দরিদ্র বালক বালিকার জন্য নয়। কিন্তু এই বালক বালিকা দুইটির তাহাতে কোন খেদ নাই—তাহাদের দেখিয়াই আনন্দ। তাহারা যখন টুলের উপর চড়িয়া জানালার ফাঁক দিয়া বাহিরের সৌন্দর্য্য দেখিতেছে তখন সহসা এক পরী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাহার পীড়িতা কন্যার জন্য নীলপাখী চায়। সে তাহাদিগকে বলিল যে, বাহিরে তাহারা যেমন সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছে তাহাদের কুটীরের অভ্যন্তরে

ঠিক তেমনি সৌন্দর্য্যই ভরিয়া আছে—কেবল তাহাদের সেই চোখ নাই যাহাতে তাহারা দেখিতে পায়। সে কাঠুরিয়া বালকের মাথায় এক মায়ার টুপি পরাইয়া দিল—তাহার মাঝখানে এক উজ্জ্বল হীরকখণ্ড—সেটি ঘুরাইলেই সকল জিনিসের একেবারে অন্তরতম মর্ম্মস্থানটি দেখিতে পাওয়া যায়। আরও একটু বেশি ঘুরাইলে অতীতকালের মধ্যে প্রবেশ করা যায় এবং তদপেক্ষা আরও একটু দূর ঘুরাইলে ভবিষ্যৎ উন্মুক্ত হইয়া যায়। এই মায়ার হীরকটি সেই অন্তর্দৃষ্টি—যাহার দ্বারা ত্রিকালের সকল রহস্যের অভ্যন্তরে মানুষ প্রবেশ লাভ করে। বস্তুত যে দৃষ্টি বর্ত্তমানের স্থূলাবরণ উন্মোচন করিয়া সকল পদার্থের অন্তরকে দেখে, সেই দৃষ্টিই অতীতের মুখের উপর বিস্মৃতির ঢাকা খুলিয়া ফেলিতে সমর্থ হয় এবং তাহার মর্ম্মে গমন করিতে সমর্থ হয়, আবার সেই দৃষ্টিই যাহা অনাগত তাহাকে কি মায়ামন্ত্রবলে নিকটবর্ত্তী করিয়া আনে। সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মাকে যে দৃষ্টি দেখিতে পায়, ভূতভব্যের অন্তরাত্মাকে তাহা কেন না দেখিবে? কারণ অন্তরাত্মা যে এক বই দুই নন্।

পরী যখন বলিল, এই হীরকের সাহায্যে তোমরা সকল জিনিসের অন্তরাত্মাকে দেখিতে পাইবে, তখন বালিকা মাইটিল্ প্রশ্ন করিল—আমি কি চিনির অন্তরাত্মাকেও দেখিতে পাইব? পরী রাগ করিয়া বলিল—এ বাজে প্রশ্ন! চিনির অন্তরাত্মা কি অন্য কোন জিনিসের অন্তরাত্মার চেয়ে বেশি করিয়া দেখিবার জিনিষ? সকলের অন্তরাত্মাই এক অন্তরাত্মা।

এইরূপে হঠাৎ সেই কুটীরের মধ্যে সেই নিশীথে কাঠুরিয়া বালকের চক্ষে এক ইন্দ্রপুরী উদ্ভাসিত হইল। কুটীরের মলিন প্রাচীর

যেন নীলকান্তমণির দ্বারা সর্ব্বত্র খচিত বোধ হইল—তাহার স্বচ্ছ দ্যুতিতে চোখ ঝলসিয়া গেল। টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি আসবাবপত্র জীবন্ত ও উজ্জল হইয়া উঠিল, ঘড়ির দোলকের দরজা খুলিয়া প্রহরগুলি ছাড়া পাইয়া হাতে হাত ধরিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের তালে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইল। রুটী বল, আগুন বল, জল বল, সমস্তই এক রমণীয় রূপান্তর লাভ করিল। কুকুর ও বিড়াল নিজ নিজ আকৃতিবিশিষ্ট মানুষের মত মূর্ত্তি লইয়া একজন বালককে ও অন্যজন বালিকাকে প্রিয় সম্ভাষণ করিল। কুকুর অসহ্য পুলকে নাচিয়া কুঁদিয়া চীৎকার করিয়া সেই ছোট মানুষটিকে আপনার সমস্ত মনের কথা জানাইল—"আমার দেবতা! আমার প্রিয় দেবতা! অবশেষে আজ আমরা কথা কহিতেছি! আমি যতই লেজ নাড়ি আর যতই ঘেউ ঘেউ করি—তুমি কি আমার মনের কথা কোন দিন বুঝিয়াছিলে? না—এখন আমার কত কথা বলিবার আছে!" জল একটি ছোট বালিকার মত—তাহার চুল এলিয়া পড়িয়াছে—তাহার চোখ অশ্রুতে ভরা! বাতির আলো উজ্জ্বলমূর্ত্তি এক কুমারীর মত—স্বচ্ছ, প্রদীপ্ত গুণ্ঠনে তাহার মুখ আবৃত! এমনি করিয়া ঘরে যাহা কিছু ছিল তাহা নিমেষের মধ্যে অপরূপ রূপান্তর লাভ করিল। অত্যন্ত সাধারণ এবং তুচ্ছ পদার্থগুলি যে 'কত সত্য কত সুন্দর কত গভীর'—প্রথমাঙ্কে তাহারি আভাস দিয়া কবি তাঁহার নাট্যের সূত্রপাত করিলেন।

পরীর নির্দ্দেশে হীরক উল্টা দিকে ঘুরাইতেই সমস্তই পূর্ব্ববৎ দীন মলিন ও তুচ্ছ হইয়া গেল। কেবল কুকুর, বিড়াল, আগুন, জল, রুটি, চিনি প্রভৃতির উদ্ঘাটিত অন্তরাত্মা বালক ও বালিকার সঙ্গে নীলপাখীর অনুসন্ধানে যাত্রা করিল! আর সঙ্গে রহিল আলো।

দ্বিতীয়াঙ্কের প্রথম দৃশ্যে পরীর প্রাসাদে ইহাদের সাজসজ্জার কথা বর্ণিত আছে। পরী সকলকে ভ্রমণের উপযুক্ত বেশভূষা পরাইয়া দিতেছে। এই সকল সঙ্গীপদার্থ এবং জীব—ইহারা যে বাস্তবিকই মানুষের বন্ধু তাহা নহে। ইহারা জানে যে মানুষ যদি একবার সেই নীলপাখীর সন্ধান পায়, সেই চরম সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে সর্ব্বত্র দেখে, তবেই ইহাদের সকল রহস্য ফাঁস হইয়া যাইবে। সে দিন মানুষের কাছে ইহাদের যে পরাভব ঘটিবে এমন বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারেও ঘটে নাই। কারণ সে দিন যে শেষ রহস্য—একেবারে প্রতি বস্তুর অন্তরস্থিত সত্য—তাহা জ্ঞাত হইবে। জন্তুদের মধ্যে বিড়াল সন্দিগ্ধ ও কপট—সে মুখে প্রীতি জানায় বটে কিন্তু ভিতরে ভিতরে ষড়যন্ত্র করে। কেবল কুকুর মানুষকে যথার্থ ভালবাসে ও তাহার জন্য সকল বাধাবিপত্তির সম্মুখে গিয়া সংগ্রাম করিতে ও প্রাণপাত করিতেও প্রস্তুত। এইজন্য এই নাট্যে আগা-গোড়া এই উভয়ের প্রকৃতিবৈষম্য ও বিবাদের বড় চমৎকার চিত্র আছে।

কিন্তু মানুষ যে আজ এত বড় হইয়াছে সে একটি জিনিসের সাহায্যে—আলোকের সাহায্যে। আদিম অরণ্যমধ্যে নিঃসহায় অবস্থায় যেদিন সে প্রথম এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই কাল হইতে ক্রমাগতই এই আলোক প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে তাহাকে জয়যুক্ত করিয়াছে এবং ক্রমে তাহার চেতনাকে উজ্জ্বল করিয়া তাহার বুদ্ধিকে বিশ্বজয়ী করিয়া দিয়াছে। অগ্নি তাহার সহায়, খাদ্য তাহার বন্ধু, কিন্তু ইহারা ভৃত্যের মত—আলোকই মনুষ্যের নেতা। তাই নীলপাখীর অনুসন্ধানের সময় সেই আলোক পুনরায় নেতৃত্ব গ্রহণ করিল। পরী বালক ও বালিকাকে বলিল—"তোমরা আজ স্মৃতির

দেশে যাও—সেখানে তোমাদের পরলোকগত দাদামহাশয় ও দিদিমার সঙ্গে দেখা হইবে।" তাহারা প্রশ্ন করিল—তাঁহারা কি এখানে?—পরী কহিল—এখনই তাঁহাদিগের দেখা পাইবে। বালক বলিল—তাঁহারা যে মৃত। পরী বলিল—যখন তোমাদের স্মৃতিতে তাঁহারা জীবিত তখন তাঁহারা মরিলেন কেমন করিয়া?

দ্বিতীয় দৃশ্যে সেই স্মৃতিপুরে যাত্রা। সেখানে কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন—ক্রমে ক্রমে কুয়াশা পাতলা হইয়া আসিল এবং অদৃশ্য হইয়া গেল। বিস্মৃতির কুয়াশা কাটিতেই তাহারা দেখে সেই তাহাদের দাদামহাশয়ের বাড়ী—যেখানে যেমনটি যাহা ছিল সেখানে ঠিক তেমনটি তাহাই রহিয়াছে। দাদামহাশয় দিদিমাও মৃত্যুর সময় যেমন ছিলেন তেমনই আছেন। তাঁহারা বলিলেন যে, পৃথিবী হইতে তাঁহাদিগকে একটিবার কেহ স্মরণ করিলেই তাঁহারা জাগেন, নহিলে নিদ্রিত হইয়া থাকেন। মৃত্যু বলিয়া তো কিছু নাই—স্মরণ করিলেই সমস্তই জীবিত। সেই ঘর, সেই দ্বার, সেই সমস্ত আসবাবপত্র, সেই গাছপালা, বাগান, সেই একটা খাঁচায় যে কালো পাখী ছিল সে পর্য্যন্ত আজো ঠিক আছে। কালো পাখীর দিকে চোখ পড়িতেই কাঠুরিয়াপুত্র বিস্মিত হইয়া দেখিল যে সেতো কালো পাখী নয়, সে নীলপাখী! বালক তখনি তাহাকে সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। দাদামহাশয় দিদিমা আপত্তি করিলেন না—কিন্তু বলিলেন যে অন্যত্র গেলে তাহার রঙ বদলাইবে কিনা তাহা তাঁহারা বলিতে পারিবেন না। তারপর বালক বালিকা দুইটি তাহাদের মৃত ভাই ভগ্নীদের কথা স্মরণ করিতেই তাহারা নাচিতে নাচিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। যে যেমন ছিল সে তেমনিই আছে—বাড়েও নাই কমেও নাই। এমনি করিয়া সকলের

সঙ্গে আনন্দে পানভোজন সারিয়া সন্ধ্যার পর তাহারা বিদায় লইল। নীলপাখীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। কিন্তু স্মৃতিপুর হইতে বিদায় লইতেই তাহারা দেখিল যে সে পাখী আর নীল নাই, কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গিয়াছে! স্মৃতির মধ্যে যে অনির্ব্বচনীয় সুখ সে সেখানেই আছে—তাহাকে অন্যত্র টানিয়া আনিয়া দেখিতে গেলে কিম্বা তাহাকেই কেবলমাত্র অবলম্বন করিয়া কাটাইতে গেলে সে সুখ কালো হইয়া যায়! এমন করিয়া দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ হইল।

তৃতীয় অঙ্কে তাহারা রাত্রির রহস্যপুরে প্রবেশ করিল। রাত্রির সহচর বিড়াল আসিয়া রাত্রিকে বিষম ভয় দেখাইয়াছে। এইবার সমস্ত রহস্য বুঝি মানুষ গ্রেপ্তার করিয়া লইবে! কারণ আলো মানুষের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছে। এইবার চাঁদের আলোয় যে স্বপ্নময় নীলপাখীরা ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদের মধ্যে যে একমাত্র সত্য নীল পাখীটি আছে তাহারি অনুসন্ধানে মানুষ আসিতেছে। কবিস্বপ্নকে এতকাল মানুষ স্বপ্ন বলিয়াই ঠেলিয়া রাখিয়াছে, এইবার তাহার মধ্যে সেই পরম সুন্দর সত্যকে বাহির করিবার তলব পড়িয়াছে। তাই রাত্রির স্বপ্নলোকে যাত্রা।

রাত্রির প্রাসাদে আসিয়া সেই ক্ষুদ্রকায় বালক প্রত্যেকটি দ্বারের চাবি চাহিল। যে হীরকখণ্ড অর্থাৎ যে অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা সে এই দাবী করিবার অধিকারী তাহা রাত্রির নয়নগোচর হইতেই রাত্রি আর দ্বিরুক্তিমাত্র করিলনা। সে সকল চাবি সমর্পণ করিল। কিন্তু কি ভীষণ! গুহার পর গুহায় কত ভূত, কত রোগ, কত যুদ্ধ, কত ছায়া, কত ভয় আবদ্ধ হইয়া আছে। তাহাদের মধ্যে একজন যদি দৈবাৎ ছাড়া পায় তবে পৃথিবীতে প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া বসে। অবশ্য কতকগুলি ভয় এখন মানুষ জয় করিয়াছে—তাহারা চলৎশক্তিরহিত

ও নির্বীর্য্য হইয়া আছে। ভূত, রোগ, ছায়া—এ সমস্তের আধিপত্য সেই আদিম যুগেই ছিল। যুদ্ধও এখন প্রায় অচল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ সকল গেল বাহিরের জিনিস—প্রাসাদের ভিতরে গেলে কত সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে। কত গন্ধ, কত আলেয়ার চমক, কত জোনাকির দীপের সার, কত শিশিরের মুক্তার মালা, কত নাইটিঙ্গেলের গান। কিন্তু এও জানা ব্যাপার—ইহারাও সেই রহস্যপুরীর নিবিড়তম প্রচ্ছন্নতম অংশে নাই। যেখানে নীলপাখী আছে এ সে জায়গা নয়। একেবারে মধ্যবর্ত্তী কেন্দ্রে এক দ্বার—সেই দ্বার কেহ কোন দিন খুলে নাই। রাত্রি বলিল যে সেই দ্বার যে একবার খুলিয়াছে সে আর ফেরে নাই। সেখানে ভীষণতা কিছুই নাই—কিন্তু এমনি এক অতলস্পর্শ রহস্য যে তার সম্মুখীন হয় কার সাধ্য! সেই দ্বার যখন বালক খুলিতে চাহিল তখন সকলেই পলায়ন করিল। কেবল ভক্ত কুকুর বালকের সঙ্গে রহিল।

এ যে কবির স্বপ্নলোক। স্বপ্নের বাগান—সেখানে গ্রহউপগ্রহ-তারকার মধ্যে চন্দ্ররশ্মি হইতে চন্দ্ররশ্মিতে, এক মণি হইতে অন্য মণিতে পরীর মত নীলপাখী ঝাঁকে ঝাঁকে উড়িয়া চলিয়াছে। মনে হয় যেন সেখানকার আকাশ নীলপাখীর উপকরণেই গঠিত। বালক চীৎকার করিয়া কত শত পাখী ধরিল—ক্রমে তাহার ভগ্নী ও কুকুর আসিয়া যোগ দিল—পাখীর দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যখন তাহারা ফিরিল তখন দেখিল সকল পাখীগুলিই মরিয়া গিয়াছে। আলোকের সামনে ধরিতেই সমস্ত স্বপ্ন ম্লান হইয়া নিভিয়া গেল। টিল্‌টিল্ দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ক্রন্দন করিল। হায়রে স্বপ্ন, হায়রে মায়া!

কোথায় নীলপাখী? তবে কি অভিব্যক্তির নানা স্তরের মধ্যে

অন্বেষণ করিয়া দেখিলে তাহাকে পাওয়া যাইবে? তাই গভীর বনের মধ্যে সকল বনস্পতি ও জন্তুগণের নিকটে তাহারা গেল ও তাহাদের অন্তরাত্মাকে সেই মায়া-হীরকের দ্বারা উদ্‌ঘাটিত করিল। তাহারা নীলপাখীকে দিবে? মানুষের প্রতি তাহাদের অন্তর ঘৃণাতে পরিপূর্ণ—মানুষকে তাহারা তাহাদের পরমশত্রু বলিয়া জানে। তাহাদের অন্তরাত্মার প্রতি কোন দিন কি মানুষ শ্রদ্ধাবান্? সে কি জলে স্থলে আপনার প্রতাপ বিস্তার করিয়া সকল প্রাণী ও উদ্ভিদকে নানাপ্রকারে নিপীড়িত করে নাই? তাহারা কি তাহার হিসাব রাখিতেছে না? সেখানে মানুষ যে একলা কি অসহায় তাহা বালক টিল্‌টিল্ বুঝিল—তাহাকে সমস্ত বনস্পতি ও জন্তুরা মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল—এমন সময় আলোক আসিয়া তাহাকে মুক্তিদান করিল। বনের অন্ধকার দূর হইতে সমস্ত বিভীষিকা চকিতের মধ্যে অপসৃত হইল।

না—অতীতে নীলপাখীকে পাওয়া গেল না। না স্মৃতিপুরে, না রাত্রির গোপন রহস্যলোকে, না অতীতের জীব-অভিব্যক্তির নানা পর্য্যায়ের মধ্যে।

তবে কোথায় পাওয়া যাইবে? কেন, বর্ত্তমানে? কোথাও কি সুখ নাই? চারিদিকে কত সহস্র সুখ ছড়াইয়া রহিয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে, সে সুখ কেমন করিয়া পাওয়া যায়? চতুর্থ অঙ্কে সেই বালক বালিকা দুইটি যখন সুখের দেশে আসিল, তখন দেখিল যে সুখের কাননে আর দুঃখের গুহায় একটি অতিক্ষীণ বাষ্পীয় আবরণের ব্যবধান মাত্র এবং মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে আবরণ উড়িয়া যাইতেছে। সুখের প্রাসাদে কত বিলাস শত সহস্র আমোদের আয়োজনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কাল কাটাই-

তেছে। একবার সুখের সন্ধানে বাহির হইয়া তাহাদের কবলে পড়িলে আর রক্ষা আছে কি! মায়া-হীরকের দ্বারা অর্থাৎ যথার্থ অধ্যাত্মদৃষ্টির দ্বারা ইহাদিগকে দেখিলে এক মুহূর্ত্তে এই বিলাসের বাহ্য চাকচিক্য বিলুপ্ত হইয়া ইহার ভিতরের কদর্য্যতা ও বীভৎসতা অনাবৃত হইয়া পড়ে। বালক তাহা প্রত্যক্ষ করিল। কিন্তু বিলাস ও ব্যসনাদি যখন অন্তর্হিত হইল, তখন সুখের প্রাসাদে দেবমূর্ত্তির ন্যায় প্রকৃত সুখদিগের রূপ দর্শন করিয়া সে বিমোহিত হইল। আলোছায়াখচিত কম্প্রোজ্জ্বল সূক্ষ্মবাস সেই দেবমূর্ত্তিগুলি আচ্ছাদিত করিয়াছে। কত গোলাপের উন্মীলন, কত জলের কলহাস্য, কত শিশিরের মুক্তাকলাপ, কত ঊষার আনীল পাণ্ডুরতা তাহাদের সেই সূক্ষ্ম বসনগুলি বয়ন করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যার কি আর অন্ত আছে—কতগুলি ক্ষণিক ও চপল শৈশবের সুখ—আবার কতগুলি তাহাদের চেয়ে দীর্ঘকালস্থায়ী। কিন্তু সে সকল সুখকে বালক টিল্‌টিল্‌ আদবেই চিনিতে পারিল না। কারণ তাহারা যে সব ঘরের সুখ। বালক প্রশ্ন করিল—"ঘরে কি সুখ আছে?" শুনিয়া তাহারা হাসিয়া বলিল—"বা রে! কি প্রশ্ন! ওরে হতভাগা, ঘরের প্রত্যেক কোণটি যে সুখে একেবারে ঠাসা। আমরা যে দিবারাত্র সেখানে নাচিতেছি, গাহিতেছি, খুসীর চোটে সমস্ত উলোট্ পালোট্ করিয়া দিতেছি! এবার যখন ঘরে যাইবে তখন যেন আমাদিগকে চিনিতে ভুল করিয়ো না।" স্বাস্থ্যের সুখ, নির্ম্মল বায়ুর সুখ, পিতামাতাকে ভালবাসার সুখ, নীল আকাশের সুখ, বনের সুখ, সূর্য্যকিরণে উজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলির সুখ, বসন্তের সুখ, পৃথিবীর সকল রাজার চেয়ে মহিমাবান্ সূর্য্যাস্ত-দেখার সুখ এবং তাহার পশ্চাতে দেবতার মত তারাগণের উন্মীলন দেখিবার

সুখ! সুখের কি আর অবধি আছে—তাহা কি আর একটি আধটি!

বালক তাহাদিগকে নীলপাখীর সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা হাসিয়া উঠিল।

তাহারা বলিল—অপেক্ষা কর, আনন্দদিগকে আসিতে দেও।

ক্রমে ন্যায়পরতার আনন্দ, মঙ্গলের আনন্দ, চিন্তার আনন্দ, বুদ্ধির আনন্দ একে একে সব আসিল—কিন্তু ইহারা দুঃখের সঙ্গে ক্রমাগতই বোঝাপড়া করিতেছে, কারণ দুঃখ যে ইহাদেরি ভাই। দুঃখকে জয় করিবে ইহাই যে তাহাদের পণ। তারপর প্রেমের আনন্দ দেখা দিল। সে থাকে বহুদূরে—সোনার মেঘের মধ্যে; তাহাকে ভাল করিয়া দেখা কঠিন! কিন্তু সেই শেষ নয়— তাহার পরে সকলের বাড়া পবিত্রতম মধুরতম এক আনন্দ আছে— মাতৃস্নেহের অতুলনীয় আনন্দ! তাহাকে আসিতে দেখিয়া অন্য সকল আনন্দ সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। মাতৃস্নেহের আনন্দ যখন বালককে দুই বাহু বাড়াইয়া বুকে করিয়া লইল—বালক বলিল—তাহাকে অনেকটা তাহার নিজের মাতার মতন দেখিতে বটে—কিন্তু তাহার মাতা তো কখনই এমন সুন্দর নন্? মাতৃস্নেহ তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে প্রতিদিনই তিনি নূতন বল নূতন সুখ পান—সন্তানের প্রত্যেকটি হাসি যে তাঁহার এক এক বৎসর করিয়া বয়স কমাইয়া দেয়। বাড়ীতে তো তাহা দেখা যায় না—এই দিব্যধামে সমস্তই সত্য রূপে দেখা যায়। তাঁহার সুন্দর পরিচ্ছদ দেখিয়া বালক অবাক্— তাহা মুক্তার না রৌপ্যের সে বুঝিতে পারিল না। মাতৃস্নেহ বলিলেন তাঁহার সেই মূল্যবান্ পরিচ্ছদ চুম্বন আদর ও স্নেহমুগ্ধ দৃষ্টি দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। মা যে এত ধনী, সন্তান তাহা

জানে না—কিন্তু মা যখনি সন্তানকে ভালবাসে তখন তাঁহার মত ধনী পৃথিবীতে আর কে আছে! আর যদি বড় দুঃখও হয় তবে সন্তানকে একবার চুম্বন করিলেই তাহার চোখের অশ্রু তারার মত উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মা'র মধ্যে ধনী নাই নির্ধন নাই, কুশ্রী নাই, সুন্দরী নাই, যুবতী নাই, বৃদ্ধা নাই—মা এক মা—প্রতি সন্তানের একমাত্র জননী। সেই মাতৃস্নেহ যে কি তাহাই জানিবার জন্য সেই বালক এই আনন্দলোকে ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়াছে। আনন্দলোক বা স্বর্গলোক আর কোথায়? যেখানে মা এবং সন্তান পরস্পরকে আদর করে—সেইখানেই তো স্বর্গ!

আলোক এতক্ষণ এই আনন্দসভায় অবগুণ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও যে জ্ঞানালোকের সঙ্গে আনন্দের সম্পূর্ণ মিলন সাধিত হয় নাই—আনন্দতো ছায়াপাতবিহীন আলোককে সহ্য করিতে সমর্থ হয় নাই—তাই আলোক মুখ ঢাকিয়া ছিল! সকল আনন্দ আলোকের মুখাবরণ উন্মোচন করিবার জন্য প্রাণপণ মিনতি করিল—কিন্তু আলোক আপনাকে নিজ স্বরূপে দেখাইল না। আনন্দগণ আপনাদিগকে ছাড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখিতে পায় না; আলোককে তাহারা একান্তই চায়। আলোক কহিল, তাহার মধ্যে সমস্ত প্রসারিত করিয়া ভূমা করিয়া সকল আনন্দ যেদিন পূর্ণতা লাভ করিবে সেদিন আজিও আসে নাই! এই খানে চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্কে ভবিষ্যতের রাজ্যে যাত্রা। অতীত গেল, বর্ত্তমান গেল—এবার ভবিষ্যতে কি আছে তাহা দেখিয়া সেখানে নীল-বিহঙ্গমের সন্ধান লইতে হইবে। এই ভবিষ্যতের লোকে আলোক ভিন্ন বালক ও বালিকার আর কোন সঙ্গী নাই। সেখানে এক সুনীল প্রাসাদে যে সকল শিশু এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই তাহারা

বাস করে। সমস্তই সেখানে ছায়াময়, অবাস্তব। নীলকান্ত মণির স্তম্ভরাজি—তাহার পাশে পাশে এক একটি দ্বার—সেই দ্বার দিয়া মহাকাল প্রত্যহ শিশুগণকে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিবার জন্য লইয়া যায়। অগণ্য শিশুর দল! তাহারা দুঃখ জানেনা, বিপদ জানেনা, তাহারা পরম আনন্দে সেখানে আছে। কেহ বা ভাবী বৈজ্ঞানিক, কেহ বা ভাবী দার্শনিক, কেহ ভাবী শিল্পী, কেহ প্রেমিক, কেহ মহাপুরুষ—পৃথিবী তাহাদের অপেক্ষায় আছে—তাহারা সেই ভবিষ্যতের মধ্যে সেই সকল অপেক্ষাকে ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। কেহ শত কেহ দুইশত বৎসর পরে সেই সম্ভাবনাকে পূর্ণ করিতে যাইবে। কত সম্ভাবনা—তাহার কি আর অন্ত আছে? মহাকাল প্রত্যহ প্রত্যূষে একবার সেই পৃথিবীর দিকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে তাহাদিগকে পার করিতেছে—পৃথিবীর প্রয়োজন অনুসারে যে যে কাজ করিবে বলিয়া স্থির আছে তাহাকে সেই কাজ করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। হঠাৎ পৃথিবীতে যাইবার সময় কাঠুরিয়া বালক ও বালিকা দুইটিকে দেখিয়া মহাকাল হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে যখন ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ড উদ্যত করিয়াছে তখন আলোক কাঠুরিয়ানন্দনকে বলিল—আমি নীলপাখী পাইয়াছি—হীরক ঘুরাইয়া দাও—মহাকাল আমাদিগকে কিছুই করিতে পারিবেনা! তাহারা সকল কালের অন্তরতম স্থানে দৃষ্টি ফেলিতে পারিয়াছে—কালকে তাহাদের ভয় কি! কালকে তো তাহারা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এইবার শেষ অঙ্ক। এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আলোক যখন বালক ও বালিকাকে তাহাদের নিজের পিতৃভবনে আনিল—তখন তাহারা নিজেদের বাড়ী চিনিতেই পারিল না। অনেক পরে

চিনিল। কিন্তু নীলপাখীর কি হইল? নীলপাখী আবার রং বদল করিয়াছে। কতবার নীলপাখী ধরা দিল এবং কতবার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। তাহাকে স্থানচ্যুত করা যায় না—সে যে সকল স্থানেই আছে। সে যে ভূমৈব সুখং—নাল্পে সুখমস্তি।

আলোক বিদায় লইল—একে একে অন্যান্য পদার্থগুলিও বিদায় লইল। কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকেরই অন্তরাত্মার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্যে—কাঠুরিয়ার স্ত্রী যখন প্রভাতে নিজের পুত্র ও কন্যাকে ঠেলিয়া ঘুম ভাঙাইয়া দিল, তখন তাহারা মাকে দেখিয়া কি আনন্দিত! তাহারা এক বৎসর ধরিয়া কত জায়গায় ভ্রমণ করিয়াছে তাহার গল্প বলিতে লাগিল—শুনিয়া তাহাদের মাতা ও পিতা বিস্মিত, উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা জানিত গতরাত্রে শিশুরা ঘুমাইয়াছে—প্রভাতে উঠিয়াছে—কিন্তু এ সব কি প্রলাপোক্তি তাহারা করিতেছে? বালক ও বালিকার চোখ তখন আবরণোন্মুক্ত হইয়া গিয়াছে। তাহারা যাহা দেখে তাহাই পরম সুন্দর, পরমাশ্চর্য্য, পরম রহস্যময়! তাহারা সমস্ত জিনিসকেই আনন্দে অভিবাদন করিতে লাগিল—আকাশ তাহাদের কাছে কি উজ্জ্বল, বন কি শ্যামল, খাদ্য কি মধুর, সমস্ত কি আশ্চর্য্য! বালক মাথায় হাত দিয়া দেখিল তাহার সেই হীরকখণ্ড আর নাই—কিন্তু সে বলিল—আমার আর উহাতে প্রয়োজন নাই। আমি পাইয়াছি, আমি আনন্দ জানিয়াছি।

এইখানে নাট্যের শেষ। "অত্যন্ত সাধারণ, অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ সকল ও জীবনের ঘটনার মধ্যে পরম সত্য, পরম সৌন্দর্য্য ও পরমানন্দ রহিয়াছে।" পশ্চিম দেশে এই বাণীর চেয়ে বড় বাণী এ যুগে আর কে বলিয়াছেন? আর একজন কবির নাম মনে পড়ে যিনি মেটারলিঙ্কের ন্যায় উপলব্ধি করিয়াছেন যে, সকল

মানুষ ও মানুষের সকল অভিজ্ঞতাই সমান, সত্য ও সমান সুন্দর। কারণ, যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে সমস্তই আছে তাহা তাহার অগণ্য বৈচিত্র্য সত্ত্বেও এক অখণ্ড বিশ্বপ্রকৃতি। উচ্চ নীচের ব্যবধান, তুচ্ছবৃহতের ব্যবধান, সুন্দর ও অসুন্দরের ব্যবধান সেই কবির কাছে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি কে? মার্কিণ কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান। তাঁহার 'Leaves of Grass' খুলিয়া যে কোন কবিতা পড়িলে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। কিন্তু আজ যাঁহার রচনার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিলাম—তাঁহার মত জীবনের রহস্যের মধ্যে,সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মধ্যে এত গভীরভাবে আর কোন্ পাশ্চাত্য কবি প্রবেশ করিয়াছেন জানি না। আমার তো আর কোন নাম মনে পড়ে না। 'নীলপাখী'কে আমি স্বচ্ছন্দে এ যুগের সৌন্দর্য্যের গীতাশাস্ত্র নাম দিতে পারি। এ যুগের সকল বিচিত্র ভাবের এক আশ্চর্য্য সম্মিলন ঐ এক গ্রন্থ বহন করিতেছে।

কবীর *

প্রাচ্যদেশীয়দিগের সম্বন্ধে ইউরোপের ধারণা এই যে, প্রাচ্যদেশীয়গণ বাস্তব পৃথিবীটাকে মায়া বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য কল্পনাকে আর সত্যাশ্রয়ী করিতে পারে নাই, তাহাকে একেবারে পক্ষিরাজ ঘোড়ার মত অনির্দ্দেশ্যতার স্বপ্নরাজ্যে ছুটাইয়া দিয়াছে। প্রাচ্যদেশীয় সকল সাহিত্যেই আলাদীনের মত অসম্ভব পুরীর সন্ধান-

* শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের গ্রন্থাবলী

নিরত, তাহাতে কেবল রূপ আর রূপকের ছড়াছড়ি। রূপগুলা অবাস্তব বলিয়াই তাহারা সহজেই আধ্যাত্মিক রূপক হইয়া উঠিতে পারে।

তা সত্য। আমরা "মিস্‌টিক্যাল্ ইষ্ট"। আমাদের দেশে কারখানার কলের ধোঁয়ায় আকাশ কালো হইয়া উঠে না, অষ্টপ্রহর কাজ অন্তহীন প্রবাহে শকটশ্বসিত ধূলিপটলে আকাশব্যাপী দৃষ্টিকে মোহাকুল করিয়া দেয় না। আমরা বাস্তবপরায়ণ নহি। আমরা নিরাবরণ চোখে জগৎটাকে এক রকম করিয়া দেখিয়া থাকি। কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে পশ্চিমে তোমরা সমস্তই আবরণের মধ্য দিয়া দেখ। সৌন্দর্য্যই বল, প্রেমই বল, মঙ্গলই বল, সমস্তই তোমাদের ঐ কর্ম্মপাকের জটিলতার ভিতরে জড়াইয়া আছে। সেই জটগুলাকে তোমরা মনের চারিদিকে ঘন করিয়া লইয়া তার পর পৃথিবীটাকে দেখ। সমস্ত জিনিসের উপরেই তাই তোমাদিগকে ভাবের রং ফেলিতে হয়, এমন একটু বিশেষত্ব ও মহিমা অর্পণ করিতে হয় যাহা সে জিনিসে স্বভাবতই নাই। তোমরা 'আইডিয়ালাইজ্' করিয়া থাক, বাস্তবের উপরে কেবলি ভাবের রং চড়াও; আমরা জানি সমস্তই মায়া ছায়া, সুতরাং আমরা যাহা দেখি তাহা একেবারে অনাবৃতভাবে এবং অব্যবহিতভাবেই দেখি। তাহা একই কালে রূপ এবং অপরূপ উভয়ই!

ইউরোপে কবিতার মধ্যে বাস্তবকে কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া সুন্দর করিয়া দেখিবার একটা প্রয়াস আছে। আকাশের নীলিমাকে সুন্দর বলিয়া উপভোগ করিতে গেলে ইউরোপীয় কবিকে তাহার সঙ্গে হৃদয়ের রংকে প্রচুর পরিমাণে মিশাইয়া দিতে হয়। বলিতে হয়—

"Come then complete incompletion, o comer
Pant through this blueness, perfect the summer!"

এস, এস ওগো চির-অপূর্ণতা, চির পূর্ণতায় এস হে পথিক
এই নীলিমার মাঝে তোমার নিশ্বাস বসন্তেরে পূর্ণ ক'রে দিক্!

প্রাচ্য কবির এ রকমই নয়। তার সাক্ষী হাফেজের এই ছত্রটি:—
"হে সাকি, দাও আমার করতলে মদের পেয়ালা দাও, আমি যেন উপরকার এই নীলবাস ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারি!" কি প্রভেদ! একজনের দৃষ্টি আবরণের ভিতর হইতে, অন্যের দৃষ্টি আবরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া! আমরা আধুনিক কালে পশ্চিম দেশে মেটারলিঙ্ক, ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্ প্রভৃতি এমন কবির কাব্য পাঠ করিয়াছি যাঁহারা কোন আবরণকে মানেন না, সমস্ত জিনিসের উপর হইতে বহু-যুগসঞ্চিত সংস্কারের আবর্জ্জনারাশি ঝেঁটাইয়া যাঁহারা তাহার বিশুদ্ধ নগ্ন মূর্ত্তি দেখিবার জন্য ব্যাকুল। তাঁহারা বলেন, সকলের অন্তরস্থিত আত্মার পক্ষে কোন বাহিরের সংস্কারের প্রয়োজনমাত্র নাই, কারণ সংস্কার তাহার পূর্ণ প্রকাশকেই অবরুদ্ধ ও আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। একবার সব সরাইয়া পর্দ্দা তুলিয়া যদি ভিতরের খবর লওয়া যায়, তবে কি অভূতপূর্ব্ব কি অনির্ব্বচনীয় রূপ সর্ব্বত্র উদ্‌ঘাটিত হইয়া যাইবে! কিন্তু পাশ্চাত্য কোন কবি হাফেজের মত এমনতর সাহসের কথা বলেন নাই—"অবগুণ্ঠনের নীচের রহস্যের কথা মাতাল বদমায়েসদের কাছে জিজ্ঞাসা কর—এ রহস্য সম্ভ্রান্ত সভ্য লোকেরা জানে না। * *" তা তো বটেই। সম্ভ্রান্ত লোক মানেই সংস্কারাশ্রয়ী ভদ্রলোক। "অন্ধকার রাত্রি, তরঙ্গের ভয়, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণা—যাহারা তীরে আছে, সেই ভারহীন যাত্রীরা আমাদের অবস্থা কিরূপে জানিবে?" যে অনেক উত্থানপতনের ভিতর দিয়া অনেক চুবানি খাইয়া, অনেক-বার ভাঙ্গিয়া অনেকবার নূতন করিয়া গড়িয়া কিছু না পাইয়াছে,

সে ছাড়া সত্যকে আর কে জানিবে? এমনতর নিরাবরণ মুক্তির বাণী, হাফেজের কাব্যে যেমন দেখিয়াছি এমন অন্যত্র দেখি নাই। ইউরোপীয় কবির নিরাবরণতা অনেক সময় বীভৎস নির্লজ্জতা, তাহা সংস্কারবন্ধহীন মুক্ত দৃষ্টি নয়। মেটারলিঙ্ক, হুইট্‌ম্যানে সে নির্লজ্জতার পরিচয় যে নাই তাহা বলিতে পারি না। মায়াকে মায়া জানে বলিয়াই আবরণকে ছিঁড়িয়া ফেলা প্রাচ্যজাতীয়ের পক্ষে এত সহজ। নহিলে যতই ইচ্ছা করুক, সত্যকে আর জানা যাইত না, মায়াই নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত ও মন ভুলাইত।

কিন্তু হাফেজ প্রভৃতির কবিতায় যাহা আমরা দেখিয়াছিলাম, তাহা আমরা পারস্য দেশেরই একটা বিশেষ সম্পদ বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম। তাহার কারণ, আমাদের দেশে ঠিক এই ধরণের কবিতা আমরা পাই নাই। বিগ্রহের সাহায্যে ধ্যান ধারণা করিবার নিমিত্ত আমাদের দেশে বিগ্রহ দেখি সত্যের স্থান জুড়িয়া বসে। তাহার ভিতরে এমন কোন আভাস বা ইঙ্গিত থাকে না, যাহাতে বুঝাইয়া দেয় যে তাহা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য নয়। আমি কোন পূজা-পদ্ধতির কথা বলিতেছি না, কিন্তু সাহিত্যেই দেখি ভাবের চেয়ে ভাবের নির্দেশ বাংলা দেশে বড় হইয়াছে। ভাবের স্বাধীনতা নাই, ভাবের শুভ্র কিরণকে আবৃত করিয়া বিগ্রহের কুহেলি দিক্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া আছে। যেমন ধর বৈষ্ণব কবিতা। ইহা অনায়াসেই হাফেজ্ প্রভৃতির কবিতার সঙ্গে তুলনীয় হইতে পারিত, কিন্তু ইহা বিগ্রহের রূপেই আপাদমস্তক এমনি বাঁধা, যে রূপের মধ্যে অপরূপকে আর দেখাই যায় না। সেই বৃন্দাবন, অভিসার, ইত্যাদি ব্যাপার—যাহা একটা কাহিনী মাত্র—তাহা চিত্তের উপর ভারের মত চাপিয়া থাকে। রূপক যদি একান্তই

রূপ হয়, তবে রস তাহাতে বাধা পায়। রূপটা কিছুই নয়, সে অপরূপকেই প্রকাশ করিবার একটা ছলমাত্র, উপকরণ মাত্র—রূপকজাতীয় কবিতার মধ্যে এই ভাবটা থাকা চাই। কিন্তু বাংলা বৈষ্ণব কবিতায় সেই ভাবটারই অত্যন্ত অভাব।

পশ্চিমদেশীয় সাধক কবীর, দাদূ প্রভৃতির কবিতাবলীর সহিত আমরা পরিচিত ছিলাম না। আমরা নিরাশ হইয়া ভাবিতেছিলাম যে, পারস্য সাহিত্য এক হিসাবে আমাদের সাহিত্যকে জিতিয়া আছে, এমন কি আধুনিক ইউরোপীয় সাহিত্যকেও বা। ভারতবর্ষ যে এতবড় অদ্বৈতকে চাহিল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তাহার বিগ্রহ বলিয়া ধ্যান করিল, যুগে যুগে মানব ইতিহাসের ঘটনালীলার মধ্যে শ্রীভগবানের অবতীর্ণ হইবার লীলা দেখিল, হায়, হায়, ভারতবর্ষের সাহিত্যে সে বার্ত্তার কোথাও কোন চেহারা ফুটিল না! কোথায় সেই একের বাণী, অনন্তের বাণী, মুক্তির বাণী! সকল রূপ, সকল রস, সকল অনুভূতি, সকল বোধের খণ্ডতার মধ্যে অনন্তের নিবিড় আনন্দের জোয়ারের প্লাবনের জয়ধ্বনি কোথাও কি বাজিল না! ইউরোপীয় চেতনায় এ বস্তু নাই। সেখানকার সাহিত্যেও তাই ইহা খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের সাধনাই যে এই দিকে! তাহা তো অনন্তকে ভাবমাত্র বলিয়া অগম্য বলিয়া দূরে রাখে না, তাহা অনন্তকে সকল সত্যের সত্য জানিয়া ব্যবহার করে। "সকল মানব-সম্বন্ধের মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে তাহার আবির্ভাব, পথে আবির্ভাব, ঘাটে আবির্ভাব!—বাঁশী যে কোথায় বাজে না তাহাতো জানি না। অনন্তের মধ্যে সমস্তকে পরিপূর্ণ রূপান্তরিত ও আনন্দঘন করিবার সাধনাই ভারতের চিরদিনের সাধনা।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন বাবুর যত্নে আমরা এমন সাহিত্যের পরিচয় লাভ করিলাম যাহা এই ভারতবর্ষের নিত্যসাধনারই ভিতর

হইতে জন্মলাভ করিয়াছে। যাহাকে তত্ত্বে জানিতাম, তাহাকে রসের মধ্য দিয়া পাইলাম। তত্ত্বে জানিয়া কি তৃপ্তি আছে! সে কি রকম জানা? যেন ফলের শাঁস বাদ দিয়া তাহার বীজকে জানা। আমরা চাই বীজকে ফলের ভিতর দিয়া পাইব। তত্ত্বকে বেদান্তে জানিব, যোগশাস্ত্রে জানিব কিন্তু জীবনের রসে আপন বলিয়া মধুর বলিয়া উপলব্ধি করিয়া প্রকাশ করিতে পারিব না, এ যে অসহ্য! তেমন করিয়া তত্ত্ব কোথাও ধরা দেন্ নাই বলিয়াই সমস্ত বিশ্ব ভারতবর্ষকে মায়াবাদী ও বিশ্ববিমুখ সন্ন্যাসী বলিয়া দূর হইতে গড় করিয়াছে! তাহারা ভারতবর্ষকে শ্মশানচারী ভস্মবিভূতিমাখা তালবেতালপরিবৃত শিবের মতই দেখিয়াছে,—মনে করিয়াছে যে বৈরাগ্যই বুঝি তাহার প্রাণ, ঐশ্বর্য্য কোথাও নাই, সৌন্দর্য্য নাই, বেদনা নাই, যৌবন নাই। কিন্তু বিশ্বসুন্দরী লোকহৃদয়মোহিনী অনন্তযৌবনা গৌরীকে তাহারা দেখে নাই,—ভারতবর্ষের সাধনায় বৈরাগ্যের সঙ্গে সঙ্গে কি ঐশ্বর্য্য যে অভেদাঙ্গ হইয়া আছে তাহার পরিচয় এম্নি করিয়াই চাপা রহিল! কবি কালিদাস তাহার আভাস দিয়াছেন, কিন্তু গীতে উৎসারিত হইয়া নানা কণ্ঠ হইতে এ বার্ত্তা না বাহির হইলে ইহার সত্যতা কে বুঝিবে?

> ছকঁ্যা অবধূত মস্তান মাতা রহৈ
> জ্ঞান বৈরাগ্য সুধি লিয়া পুরা।
> শ্বাস উশ্বাসকা প্রেম প্যালা পিয়া
> গগন গরজৈ তঁহা বজৈ তূরা।

"বৈরাগী তৃপ্ত হইয়া মত্ত হইয়া রহিয়াছে, (এতদিনে) তাহার জ্ঞান বৈরাগ্যকে সে পরিপূর্ণ শুদ্ধ করিয়া লইল, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রেমপাত্র সে পান করিয়া লইল। গগন যেখানে নিনাদিত, বাজিতেছে সেখানে তূরী।"—কবীরের কাব্যে ভারতবর্ষের জ্ঞান-

বৈরাগ্য পরিপূর্ণ প্রেমের আনন্দে জীবনের আনন্দে পূর্ণ হইয়া দেখা দিল!

কিন্তু মুক্তার মনোহারিত্বের সঙ্গে সঙ্গে ডুবারীর পরিশ্রম ও কৃতিত্বের কথাটাও ভুলিবার নয়। কবীরের রত্নরাজি যিনি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে বিচিত্র বাজে আবর্জ্জনাস্তূপের ভিতর হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাঁহার নিকটে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। যিনি এমন পাকা জহরী, কোন্‌টা সাঁচ্চা কোন্‌টা ঝুটা যিনি এমন সুন্দররূপে তাহা জানেন, তিনি শুধুই যে কেবল অনুবাদ দিয়া,—তাঁহার অন্তরের দীপশিখায় কবিকেই দেখাইয়া নিজে অন্ধকারের আড়ালে থাকিবেন—তাহা হইলে চলিবে না। শুধু প্রদীপার্চ্চনা নয়, ভক্তের কাছে কিছু মাঙ্গলিক শ্রবণ করিতেও আমরা অভিলাষী রহিলাম।

কবীরকে পাইয়া আমরা বুঝিয়াছি যে পারস্যে হাফেজ প্রভৃতির ভিতরে মুক্তি ও ভক্তির যেমন এক আশ্চর্য্য সমন্বয় প্রকাশ পাইয়াছিল, মুসলমানের আগমনে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেই জিনিসই ভারতবর্ষে আসিয়া নূতনতর এবং পূর্ণতর রূপ ধারণ করিয়াছে। মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু সেই যুগে ভাবের খুব একটা বড় জায়গায় মিলিয়াছে।

বঙ্গীয় পাঠকের কাছে এখন এ কথাটা অদ্ভুত ঠেকিতে পারে। কারণ, এখন আমরা মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর ভাবের মিল খুঁজিয়াই পাই না। আমরা যদি কলারপাতার খাই সোজাদিকে, মুসলমান খায় উল্টাদিকে। ইদ্ উপলক্ষ্যে গোহত্যা লইয়া দুই পক্ষে খুনাখুনিই চলে।

তাহা ছাড়া আমাদের হিন্দুধর্ম্ম বিগ্রহকে সর্ব্বত্র স্বীকার করে, মুসলমান বিগ্রহ সহ্য করিতে পারে না। কোন মূর্ত্তি, কোন চিহ্ন,

কোন রূপক তাহার মস্তিষ্কের কোন গোপন কোণেও স্থান পায় না। গ্রীক্ ধী-শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী মিনার্ভার মত তাহার মাথাটা যেন লোহার—তাহা কেবলি কঠিন। নিরলঙ্কার, নিটোল একেশ্বরবাদ ভিন্ন আর কোন জিনিস তাহার মধ্যে নাই। সুতরাং এক সময়ে হিন্দু মুসলমানে ভাবের ক্ষেত্রে বড় একটা মিল হইয়াছিল বলিলে আমাদের কথাটাকে নিতান্তই একটা কাল্পনিক উচ্ছ্বাসমাত্র মনে হওয়া পাঠকের পক্ষে স্বাভাবিক।

অথচ মুসলমানধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মোহম্মদ যদিচ প্রতিমার বিরোধী ছিলেন, তথাপি একদিকে তাঁহার চিত্ত যথেষ্ট ভাবুক ছিল। এক ঈশ্বর আছেন মাত্র, এই কথাই তাঁহার একমাত্র কথা নহে, কিন্তু সেই এককে তিনি বিচিত্র ভাবসৌন্দর্য্যের স্বপ্নের মধ্যে দেখিতেন। সেইজন্য ক্ষণে ক্ষণে তিনি মূর্চ্ছাহত হইতেন, আনন্দে আপনাকে আর ধারণ করিতে পারিতেন না। মোহম্মদের সময়েই আরবে 'হনিফ্' নামক এক ভাবুক সম্প্রদায় ছিল, তাহাদের দ্বারাই তিনি যে প্রথমে প্রবুদ্ধ হন, কোন কোন ঐতিহাসিক এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন।

তার পর যখন ইস্‌লামধর্ম্ম দিগ্বিজয়ে বাহির হইল এবং বোগ্‌দাদে খলিফদিগের রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন হইতে বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও নিওপ্লেটনিক ধর্ম্মমতের সংঘর্ষে মুসলমানধর্ম্মের মধ্যে পরিবর্ত্তন দেখা দিল। খলিফ মমুনের সময়ে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে পুরাতন ধর্ম্মবিশ্বাসে অনেক লোকেরই আস্থার অভাব দেখা গেল। কোরাণের ধর্ম্ম কি না Revelation অর্থাৎ প্রেরিত পুরুষের কাছে স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিত ধর্ম্ম, তাই একদল লোকে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া কহিল, ধর্ম্মের ভিত্তি Reason-এর উপর অর্থাৎ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বোগ্‌দাদের ইতিহাসে কেবলি যুদ্ধ, বিলাসিতা,

ধর্ম্মের কৃত্রিমতা এবং এই অবিশ্বাস—এই সমস্ত ব্যাপার মানুষকে ভিতরে ভিতরে এমনি শুষ্ক করিয়া আনিল যে ইহার প্রতিক্রিয়া না হইলেই নয়। তাই এই শতাব্দীর কাছাকাছি আমরা সুফীধর্ম্মের ভক্তিবাদের প্রথম সূচনার পরিচয় পাই। সেই ভক্তিস্রোত আত্ম-জ্ঞানকে এবং ঈশ্বর-প্রেরণাকে এমন করিয়া মিলাইল, বিশ্বভুবনের মধ্যে বিশ্বপতিকে এমন একান্ত আপনার, এমন পরম প্রিয়রূপে স্বামীরূপে দেখিল, যে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কবীরের প্রায় এক শতাব্দী পূর্ব্বে হাফেজ প্রভৃতি কবি এই সুফীভক্তির উচ্ছ্বাসকে কাব্যের অপরূপ প্রকাশে মুক্ত করিয়া দিলেন। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি হইল একটি বাগান, বহিল সেখানে প্রেমের দক্ষিণ বায়ু, তাহার অব্যক্ত মর্ম্মকথা বুলবুলের কাকলীতে গীত হইয়া ফিরিল, আনন্দ-মদিরায় রঞ্জিত আত্মা আপনার প্রেমের মধ্যে আপনার অনিন্দ্য-সুন্দর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমোহিত হইল।

কবীরের প্রসঙ্গে মুসলমান ইতিহাসের এই অংশটুকুর আলো-চনার এইজন্য প্রয়োজন যে, আমাদের জানা উচিত যে মুসলমান আগমনে কেবল যে হিন্দুমন্দিরের দেবদেবী ধ্বংস হইয়াছিল তাহা নহে, এই ভক্তিবাদ এবং তাহার সাহিত্যের সঙ্গেও ভারতবর্ষের প্রথম পরিচয় ঘটে। সেই সঙ্গে সাধারণ মুসলমান-ধর্ম্মের গোঁড়ামি, প্রতিমার প্রতি অভক্তি ও অবজ্ঞা, এ সমস্তই অবশ্য ছিল। তখন পৌরাণিক যুগ। ভারতবর্ষে তখন দেব দেবীর ছড়াছড়ি। বৌদ্ধধর্ম্মের অবসানে অনার্য্য দেবতাগুলি আর্য্য সভায় স্থান পাইয়াছে। তাহাদের প্রত্যেককেই বড় ভাবের দ্বারা শোধিত সংস্কৃত করিয়া প্রত্যেককেই প্রত্যেকের চেয়ে বড় করিয়া তুলিবার জন্য লড়াই চলিতেছে। মন্ত্র তন্ত্র আচার অনুষ্ঠানের বাহুল্য ধর্ম্মকে আকীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। সেই সময়ে হঠাৎ একেশ্বরবাদের

ধ্বজা উড়াইয়া আসিল মুসলমান। সে এক দানব বিশেষ, না মানে গঙ্গাস্নান, না মানে পূজা অর্চ্চনা, না মানে ছাপা তিলক! সে তেত্রিশ কোটি দেবতাকে উড়াইয়া দিয়া বলিল—একমাত্র ঈশ্বর আছেন, আর দ্বিতীয় নাই।

এই একেশ্বরবাদের কথাতো ভারতবর্ষে নূতন নহে, সুতরাং এই সময়ে মুসলমানের আঘাতে ভারতবর্ষের চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল, মুসলমান যে ধর্ম্ম লইয়া আসিয়াছে তাহা আমাদেরি জিনিস, তাহার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের বিরোধ নাই। কিন্তু মুসলমান যে এক ঈশ্বরের কথা বলিতেছে, তাহা যে নিরাকার ও রূপরসবর্জ্জিত, তাহা নহে,—সকল আকারকে সকল রসকে পূর্ণ করিয়া তাঁহার প্রকাশ। কিছুই তাঁহাকে ছাড়িয়া নাই; তিনি সকল ঘট পূর্ণ করিয়া ও সকলকে অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নানাস্থানে যে ধর্ম্মের আন্দোলন জাগিল তাহার মর্ম্মগত কথা ইহাই। বাংলায়, পঞ্জাবে, উত্তরভারতে ও দক্ষিণে,—চৈতন্য, নানক, কবীর, দাদূ, রামানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই ভাবের প্রবল বন্যায় সমস্ত দেশকে ভাসাইয়া দিলেন। হিন্দু মুসলমান উভয়েই তাঁহাদের দলের মধ্যে সমান স্থান লাভ করিল।

তবে বাংলায় যে ধর্ম্মান্দোলন হইয়াছিল তাহার সঙ্গে অন্যান্য স্থানের আন্দোলনের একটুখানি পার্থক্য আছে। আমার মনে হয় মুসলমান প্রভাব উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের মত বাংলা দেশে তেমন কাজ করে নাই। কবীর তো নিজেই মুসলমান ছিলেন, বাবানানক মুসলমান শাস্ত্র সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। মুসলমানের যে নিরাবরণতার কথা প্রবন্ধের আরম্ভে উল্লেখ করিয়াছি—সুফী ভক্তিবাদেও যাহা বিকৃত হয় নাই, কিন্তু সকল সংস্কারকে ছিন্ন করিয়া রূপের মধ্যে অপরূপের আবির্ভাবকে দেখি-

র্যার জন্য সাধনা করিয়াছে—সেই নিরাবরণ মুক্তি, সেই একের সুস্পষ্ট বাণী বাংলা দেশের ভক্তিধর্ম্মকে স্পর্শ করে নাই।

বাংলা দেশের বৈষ্ণব ধর্ম্মের পিছনে সেই নিরাবরণতার কাঠিন্য না থাকাতে তাহা ভক্তিকে বিশ্বপ্রকৃতিতে, মানবের জ্ঞান ও কর্ম্মের সাধনায় বিস্তারিত না করিয়া আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ত হইবার চেষ্টা পাইয়াছে। ভক্তিই বল, জ্ঞানই বল,—কিছুই আপনাকে আপনি খাইয়া বাঁচিতে পারে না। বিশ্বের মধ্যে তাহাদিগকে প্রসারিত করিয়া না দিলে তাহারা মাদকতার সৃষ্টি করে। কেবলি রাধিকা সাজিয়া, কখনো বিরহ, কখনো মিলন, কখনো মান, কখনো অভিমানের কাল্পনিক লীলায় হৃদয়-বৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া যে সাধনা, তাহার সঙ্গে বিশ্বের জ্ঞান, বিশ্বমানবের বিপুল ইতিহাসের বিচিত্র সৃজনলীলার কোন যোগ থাকে না। বৈষ্ণব-কাব্যে তাই মাধুর্য্যের উচ্ছ্বাস আছে প্রচুর, কিন্তু সে মাধুর্য্যের মধ্যে কোন বড় সত্যের প্রতিষ্ঠা নাই। তাহা অশান্ত, চির-অপরিতৃপ্ত—তাহার শেষ কথা এই ঃ—

> রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি
> বুঝিতে নারিনু বন্ধু তোমার পিরীতি।

পারস্য সাহিত্যের কথা আরম্ভেই বলিয়াছি। তাহাও আবেগে উদ্বেল, কিন্তু তাহার ভিতরে একটি নিরাবরণতা, সত্যের মধ্যে একটি অনায়াস মুক্তির সাধনার বার্ত্তা আছে। হাফেজের কথা বলিয়াছি, তাঁহার সমস্ত কবিতাই এই ভাবে পরিপূর্ণ। এ কথা কোন্ ইউরোপীয় কবি প্রণয়সঙ্গীতে লিখিয়াছে যে দরবেশের মধ্যে যথার্থ বৈরাগ্য নাই, যথার্থ বৈরাগী প্রেমিকের; প্রিয়ার চোখের চাহনি হইতে কবি এমন সম্পদ লাভ করিতেছেন যাহা তাঁহাকে আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করিতেছে? হাফেজের কবিতায় কেবল মদ

আর সাকীর ছড়াছড়ি, কিন্তু সে আনন্দের রূপক মাত্র। শুধু তাই নয়, তাহার মধ্যে একটা প্রথার প্রতিও বিদ্রোহ-ঘোষণা আছে। বাহ্যে মৌখিক আচারগত ধর্ম্মের প্রতি কবির একটা আন্তরিক সুতীব্র বিদ্বেষ রহিয়াছে। সেই জন্য যাহা রীতি-বিরুদ্ধ, যাহা নীতির সংস্কারানুযায়ী নহে তাহাকেই অবলম্বন করিয়া কবি আত্ম-প্রকাশ করিয়াছেন।

যাক্ সে কথা। কবীরের মধ্যে আমরা এই জায়গায় পারস্য সাহিত্যের এই ভাবটির সঙ্গেই একটা মিল পাই। তাহা বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্যের মত কেবলি মাধুর্য্যের ব্যক্তি নহে, তাহার মধ্যে মুক্তি ও ভক্তি এই দুই আসিয়া মিলিয়াছে। প্রেম আর বৈরাগ্য এক হইয়াছে। খুব সম্ভব কবীর যেমন হিন্দু বেদান্ত প্রভৃতির বার্ত্তা অবগত ছিলেন, রামানন্দকে গুরু করিবার জন্য দ্রাবিড়ের ভক্তি-ধর্ম্মের সঙ্গে যেমন পরিচিত ছিলেন, তেমনি মুসলমান হইবার জন্য বোধ হয় মুসলমান সাধনার এই সকল গভীর তত্ত্বও তাঁহার অগোচর ছিল না। তিনি হিন্দু মুসলমান উভয় সভ্যতারই প্রাণ-রসে চিত্তকে রসাইয়া লইয়া জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্যের ভাবে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন।

কবীরের দোঁহাবলীকে ক্ষিতিমোহন বাবু যে সকল ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন তাহা শ্রেণীবিভাগ নয়, তাহা কবীরের এক একটা দিক্‌কে উদ্ভাসিত করিয়া দেখাইবার উপায় মাত্র। তাঁহার ভাগ মোটামুটি পাঁচটি—কবীর পরখ, কবীর উপদেশ, কবীর সাধনা, কবীর তত্ত্ব ও কবীর প্রেম। কবীর পরখ, উপদেশ ও সাধনাকে আমরা স্বতন্ত্র করিয়া দেখিব না, কারণ এ তিনের মধ্যেই সাধনার সংবাদ রহিয়াছে। কবীর তত্ত্ব ও কবীর প্রেমের স্বতন্ত্র ভাগের সার্থকতা আছে।

কবি হাফেজের ন্যায় কবীর ধর্ম্মের সমস্ত সংস্কারকে একেবারে উড়াইয়া দিয়া, আচার হইতে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা বারম্বার প্রকাশ করিতেছেন।

কোই রহীম্ কোই রাম বখানৈ
কোই কহে আদেস।
নানা ভেষ বনায়ে সবৈ মিল
ঢুঁর ফিরে চহুঁ দেস ॥

"কেহ বলেন রাম আমার উপাস্য, কেহ বলেন রহীম্, কেহ বলেন প্রত্যাদেশ, এইরূপে সকলেই নানা ভেক ধারণ করিয়া ঘুরিয়া মরিতেছেন।"

অরে ইন্ দুহু রাহ ন পাঈ।
হিঁনুদুকী হিংদরাঈ দেখী
তুর্কনকী তুরকাঈ।

"হায় রে এই উভয়ই পথ পায় নাই। হিন্দুর হিঁন্দুয়ানী দেখিয়াছি, মুসলমানের মুসলমানী।"

আমাদের সমাজ এখন এই আচারের বন্ধনে এমনি আপাদমস্তক জড়িত যে হঠাৎ এ সকল ক্রিয়াকর্ম্মে বাহ্য আচার অনুষ্ঠানে কোন ফল নাই শুনিলেই আমরা আঁতকাইয়া উঠি এবং জিজ্ঞাসা করি, তবে কিসের উপর আমরা ভর করিব? স্বাধীনতা বলিয়া যে একটা পদার্থ আছে, যে আপনিই আপনার নিয়ম, আপনিই আপনার জগৎ, অথচ যাহা উচ্ছৃঙ্খল নহে, যাহা আপনাকে লাভের দ্বারাই বিশ্বকে লাভ করে, সে কথাটা আমাদের চেতনার মধ্যেই নাই। প্রকৃত সাধনা যে সেই আপনার ভিতরকার আপনকে লাভ করা, কবীর সে কথা বলিয়াছেন:—

সাধো, সো জন উতরে পারা
জিন মনতে আপা ডারা ॥

"যে জন মন হইতে আপনাকে দূর করিয়াছে, সেই উত্তীর্ণ হইয়াছে।" অর্থাৎ মনের দাসত্ব যে করে না, সংস্কারকে যে কাটাইয়া উঠিয়াছে; যে একেবারেই সব জিনিসের সত্যকে দেখিতে পায়, কোন আবরণের ভিতর হইতে দেখে না; যাহার কাছে যোগ, বৈরাগ্য, কোনটাই শেষ কথা নহে; যে সমস্ত পন্থার ভিতর দিয়া গিয়া মনের সমস্ত অভ্যাসের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, আপনার আপনিকে লাভ করিয়াছে—সেই যথার্থ ভাবে মুক্ত। কবীর একেবারে স্বাধীনতার মূলে গিয়া ঘা দিয়াছেন।

"হে ভাই, যখন আমি ভুলিয়াছিলাম, তখন সেই আমার সদ্‌গুরুই আমাকে পথ দেখাইয়াছেন। আমি তখন ক্রিয়াকর্ম্ম আচার ছাড়িলাম, তীর্থে তীর্থে স্নান ছাড়িলাম। * * সেই দিন হইতে আমি না জানি দণ্ডবৎ প্রণাম, না বাজাই ঘণ্টা, না আমি সিংহাসনে কোন মূর্ত্তি স্থাপন করি, না আমি পুষ্পের দ্বারা কোন প্রতিমা অর্চ্চনা করি।"

"যে পর্য্যন্ত পরমাত্মার সহিত পরিচয় হয় নাই, সে পর্য্যন্ত কিছুই পাও নাই। তীর্থ, ব্রত, জপ, তপ, সংযম এ সকল কর্ম্মেই ভুলিয়া থাকিও না।"

* আমাদের দেশে অধুনা কোন দলবিশেষে সাকার নিরাকার উপাসনার সমন্বয় সম্বন্ধে একটু বিশেষ গৌরবের দাবী দেখিতে পাওয়া যায়। সে সমন্বয় ব্রহ্মকেও মানে আবার কালীদুর্গা পূজাতেও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহা তর্ক করিয়া বলে যে ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপী তখন তাঁহাকে যাহাতে খুসী তাহাতেই ভজনা করা যায়। কিন্তু আসলে ভজনা হয় না সর্ব্বব্যাপী দেবতাকে, ক্ষুদ্র দেবতাই সমস্ত পূজা আহরণ করিয়া থাকেন। নিজের লোভ, নিজের স্বার্থ, নিজের ক্ষুদ্র ভয়ের দ্বারা সেই দেবতা তৈরি; অথচ তাহাকে বড় নাম দিয়া

কাঁপাইয়া তুলিবার জন্য কতই আয়োজন! এমতাবস্থায় সমন্বয়টা যে কিরূপ হয় তাহাই জিজ্ঞাস্য। যাহা সকলের বড়, যাহা দেশ কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নয়, যাহার মধ্যে সমস্তের পরম পরিণতি চরম অবসান, সেই পরিপূর্ণতম সত্যের সঙ্গে নিজের কল্পনারচিত প্রবৃত্তির মোহময় অসত্যের সঙ্গে সমন্বয়টা হইবে কোন্ জায়গায়?

আধুনিক সাকার নিরাকার উপাসনার সমন্বয়িগণকে একবার কবীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করি। কবীর যে, সকল সীমার মধ্যে অসীমকে দেখিয়াছেন, তাহা কোন মনঃকল্পিত মূর্ত্তি-বিশেষের মধ্যে দেখা নয়। তাহা অসীমকে শূন্য বলিয়া না জানিয়া তাহাকে সব জায়গায় স্বীকার করা, সর্ব্বঘটে দর্শন করা, সকল জীবনের ভাব ও অনুভূতিরাশির মধ্যে গূঢ়রূপে উপলব্ধি করা। আর এ সাধনার প্রধান অন্তরায়ই বাহ্যিকতা। মনে রাখিতে হইবে যে কেবল বাহ্য অনুষ্ঠানাদির অসারতা প্রতিপাদন করাই কবীরের উদ্দেশ্য নহে। যাহারা বাহ্য পূজারীতি ত্যাগ করিয়া আত্মার মধ্যেই নিখিল সত্যকে ধ্যান ও উপলব্ধি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এই কথা বলে, তাহারাও যে সকল সময়ে যে ব্যক্তি বাহ্য পূজায় ডুবিয়া আছে তাহা অপেক্ষা উন্নততর হয় তাহা নহে। তাহারা হয়ত স্নান ও ছাপাতিলকের পরিবর্ত্তে কথা ও মতকে সাজাইয়া রাখিয়াছে, এবং দিনের পর দিন সেই শুষ্ক আন্তরিকতাশূন্য মূঢ় সাধনায় কালাতিপাত করিতেছে।

কবীর তাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

অুদ্ধ্ মায়া তজী ন জাঈ

মায়া কেমন করিয়া ত্যাগ করা যায় বলতো ভাই?

মনবৈরাগী মায়াত্যাগী

শব্দমেঁ সুরত সমাঈ

মন বৈরাগ্যবশতঃ মায়াকে ত্যাগ করিল অথচ শাস্ত্রকে আঁকড়াইয়া রহিল।

আধুনিককালে আমাদের অনেকের দেবতা কি সেই শাস্ত্রের দেবতা বাক্যের দেবতা নন্‌?

এড্‌মণ্ড হোল্‌ম্‌সের কবিতা

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যে আজকাল যে সকল কাব্য বাহির হইতেছে তাহাতে বলিবার বিষয় অপেক্ষা বলিবার ভঙ্গীরই অধিক প্রাধান্য বলিয়া মনে হয়। ফুলের মত সরস ও মধুর বাক্যকে নানা ছন্দের গ্রন্থনে অপূর্ব্ব মালিকার মত গাঁথিয়া তুলিবার এমন নৈপুণ্য ইংরেজী সাহিত্যে বোধ হয় ক্লাসিক্যাল যুগে ভিন্ন অন্য কোন কালে দেখা যায় নাই। কিন্তু কথার ভিতরকার রস বিদেশীর পক্ষে উপভোগ করিবার চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহা এমনি দেশের মাটীর জিনিস এবং এত বিচিত্র ভাবের সঙ্গতিসূত্রে তাহা জড়িত যে, তাহার রসটুকু রঙটুকু হিল্লোলটুকু দেশের মাটীকেই আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। কথার অন্তরালে যখন ব্যথা ক্রন্দিত হইয়া উঠে, তখনই তাহার ভাষা বিশ্বভাষা হয়, তখন সেই ভাষার আভাসে সকল মানব হৃদয় বিস্মিত ও আলোড়িত হইতে থাকে।

সাহিত্যের অন্তরকে এমনি করিয়া নাড়া দিবার এক একটা মহা মহা পর্ব্ব আছে। সেই সময় সাহিত্যের বাঁশী যে সুরে বাজে তাহাতে দূর দূরান্তরের পথিককে ঘরে আকর্ষণ করিয়া আনে, এবং ঘরের লোককে উন্মনা করিয়া কোন্‌ সুদূরলোকে বাহির করিয়া দেয়।

কাব্য তখন আর দেশকালের কুলবন্ধনে বাঁধা থাকে না, তাহার কূলপ্লাবী বন্যা বিশ্বের অভিমুখে ছুটিয়া যায়। তাহার কথা তখন যতই অপরূপ হউক না কেন, তাহা উপলক্ষ্য মাত্র—কথার সকল ছিদ্ররন্ধ্র তখন ব্যথার হিল্লোলে ভরিয়া যায়। সে ব্যথা কি সামান্য ব্যথা—সে জগৎজোড়া ব্যথা, বিশ্বমানবের অনাদি বিরহ বেদনা।

দেশের ভিতর হইতে নানা কারণের সমাবেশে নানা অভাব দুঃখ ও পীড়ার ফলে এইরূপ বেদনার উদ্বোধন হওয়া আশ্চর্য্য নহে; কিন্তু ইংলণ্ডের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই যে বাহির হইতে আঘাত আসিয়া তাহার চিত্তসমুদ্রকে এক এক যুগে অশান্ত ক্রন্দনে ক্রন্দিত করিয়াছে। এক একবার এক একটা হাওয়া আসিয়াছে আর নানা ভাবের তরঙ্গসংঘাতে কখনও নাট্যঝটিকার রুদ্রলীলা, কখনও গীতিকাব্যের তরল ঝঙ্কার জাগিয়াছে। একবার ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের হাওয়া আসিয়াছিল। এক হাওয়ায় জাগাইল নাট্যের প্রচণ্ড ঝড়, অন্য হাওয়ায় বাজিল গীতিকাব্যের করুণ কলোচ্ছ্বাস।

বাহিরের হাওয়া যখন বন্ধ হয়, তখনই দেখি ইংরেজী সাহিত্যে ফেণার মালা গাঁথিবার পালা। পোপ ড্রাইডেনের যুগে একবার সে পালা অভিনীত হইয়া গিয়াছে। আধুনিক যুগে পুনরায় সুরু হইয়াছে। ইহাতে কলানৈপুণ্যের যে চর্চ্চা হয় তাহার যে কোনো মূল্য নাই এমন কথা বলি না। বস্তুত পোপ ড্রাইডেনের সময়ে ইংরেজী সাহিত্যের কলাসৌষ্ঠববৃদ্ধির যদি আয়োজন না হইত, তবে রাষ্ট্রবিপ্লবের হাওয়া বহিতেই, শেলী প্রভৃতির কাব্যে ভাষার অমন সুন্দর কলনৃত্যলীলা দেখা যাইত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তথাপি এ নৈপুণ্যে কলার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অন্তর ভরে না। এ যেন রঙীন

কাগজের ফুলে মালা গাঁথা—তাঁহাকে উপহার দিতে গেলেই তিনি বলেন—কৈ, এতো জীবন্ত নয়, ইহার মধ্যে তো বসন্তের গন্ধ নাই, আকাশের নিঃশ্বাস নাই!

কিন্তু ইউরোপে কিছুকাল হইতেই একটা অজানা দেশের হাওয়া মন্দ মন্দ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। যে দিনই তাহা প্রবল হইবে, সেই দিনই ইউরোপীয় সাহিত্যে একটা নবজাগরণ দেখা দিবে আশা করা যায়। সে হাওয়া প্রাচ্যদেশের বহুযুগসঞ্চিত তত্ত্বজ্ঞান ও অধ্যাত্ম সাধনার নিগূঢ়গোপন লোক হইতে প্রবহমান হইয়া ক্ষণে ক্ষণে সমুদ্রের অপরপারের মানবমনকে ভিতরে ভিতরে পুলকচঞ্চল করিতেছে। প্রথমে তাহার সংবাদ পায় জর্ম্মাণ পণ্ডিতকুল। তাহারা প্রাচ্যদেশের ভাণ্ডার হইতে প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে লোকে চমৎকৃত হউক বা না হউক কাহারও মন মজে নাই। রসের খবর না পাইলে কি মন মজে? আর পণ্ডিতের কি সাধ্য যে রসের সংবাদ আনে? তাহারা রাজবাড়ীর বাহিরের প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গিয়া কৌতূহল নিবৃত্তির দুটি একটি নিদর্শন মাত্র বহন করিয়া আনে—সেই সকল নিদর্শন দেখিয়া বরং মনে হইতে পারে যে প্রাচ্যদেশটা অত্যন্ত অদ্ভুতগোচের দেশ। হয়ত একটা নাগকন্যা বা যক্ষীর মূর্ত্তি বা রাজবাড়ীর প্রহরীর পাগড়ী বা রাজার সভাপণ্ডিতের দুএকখানি ভারী পুঁথি। যেখানে আসল মজ্‌লিস্, সেখানে পণ্ডিতের প্রবেশ নাই। রাজবাড়ীর প্রহরীপণ্ডিতেরা তাহাকে বাহির হইতেই আপনাদের দলের লোক বলিয়া সমাদর করিয়া লয়।

বুদ্ধদেবের জীবনী ও উপদেশ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত কত পণ্ডিতেরই পুঁথি বাহির হইয়াছে কিন্তু তাহাতে বুদ্ধদেব অজ্ঞেয়বাদী ও তাঁহার উপদেশগুলি নীতি উপদেশ মাত্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যখন এড্‌মণ্ড হোল্‌ম্‌সের 'The Creed of Buddha' পড়ি, তখন বুদ্ধদেবের সাধনা ও বাণীর সম্যক্ পরিচয় লাভ করিয়া বিস্মিত হই। হোল্‌ম্‌স্ পণ্ডিত ব্যক্তি নহেন। কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে তিনি পণ্ডিতগণের আহৃত উপকরণের সাহায্যেই বুঝিয়াছিলেন যে উপনিষদের "সর্ব্বভূতান্তরাত্মার"—সর্ব্বভূতে যে পরম এক বিরাজিত আছেন—সেই তাঁহার জ্ঞানগত উপলব্ধি বুদ্ধদেবের সাধনায় প্রত্যক্ষীকৃত হইয়াছিল। "সর্ব্বভূতকে সমভাবে মৈত্রী কর," "অপরিমাণ দয়াকে সর্ব্বত্র বিস্তার কর"—বুদ্ধের এই উপদেশ উপনিষদে যাহা জ্ঞানে উপলব্ধ হইয়াছিল তাহাকে ব্যাবহারিক জীবনে প্রত্যক্ষ করিবারই উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছে। আত্মা আছে কি নাই এ সম্বন্ধে বুদ্ধদেব হয়ত নীরব ছিলেন, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? আত্মোপলব্ধির উপায় বুদ্ধ যাহা বলিয়াছিলেন,—তাহাই যে প্রকৃষ্ট উপায়। তাহা অবলম্বন করিলে বিশ্বাত্মা কি আর কল্পবস্তু মাত্র থাকেন? সকল পদার্থকে আপন জ্ঞান করিয়া প্রীতি করিলেই সকল পদার্থের অন্তরতম আত্মা উদ্ভাসিত হন্।

"The Creed of Buddha" গ্রন্থখানি এরূপ অপূর্ব্ব হইলেও তাহা সাহিত্যক্ষেত্রে অদ্যাপি সবিশেষ পরিচয় লাভ করে নাই। তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রাচী'র হাওয়া পশ্চিমে এখনও প্রবলবেগে বহিতে আরম্ভ করে নাই। এখনও পণ্ডিতদিগের আধিপত্য—তাহারা কোন্ পুঁথি হইতে কি বচন উদ্ধার করে তাহারই দিকে সকলের ষোল আনা নজর। পশ্চিমের সাহিত্যের প্রাণকে প্রাচ্যদেশ এখনও নাড়া দিতে পারে নাই, যদিই বা দিয়া থাকে তবে সে আঘাত এতই ক্ষীণ যে তাহার স্পন্দন বুদ্বুদেরই মত উত্থিত হইয়া বিলীন হইয়া যায়। অধ্যাপক ডয়সন্ "উপনিষদের তত্ত্ব" নামক এক বিরাট্ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কিন্তু যদি দেখি যে

এমার্সনের মত কোন কবি জীবনের ক্ষুধার তাড়নায় উপনিষদ লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তখনই বুঝিব যে উপনিষদ যথাস্থানে গিয়া কাজ করিতেছে। তখনই দেখিতে দেখিতে উপনিষদের ভাবে অনুপ্রাণিত নূতন কাব্য নূতন সাহিত্য জন্মলাভ করিবে।

এড্‌মণ্ড হোল্‌ম্‌সের "ক্রীড্‌ অব্‌ বুদ্ধ" পাঠ করিয়া এই কথাই বারম্বার মনে হইয়াছিল। এই একজন লোক—যে জীবনের সাধনার ভিতর হইতে বুদ্ধচরিত ও বুদ্ধের বাণীকে দেখিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহার পাণ্ডিত্য কিছুই নাই বলিলেই হয়, কিন্তু তাহার অন্তর্দৃষ্টি আছে। সে যেটুকু যাহা জানিয়াছে তাহা হইতে একটি সমগ্রের বোধ তাহার অন্তর্দৃষ্টির আলোকে তাহার মধ্যে জাগরূক হইতে পারিয়াছে।

তখন কে জানিত এড্‌মণ্ড হোল্‌মস্‌ একজন কবি! জহরী রত্নকে চেনে। উপনিষদের স্তন্যরসে পুষ্ট একজন কবি তখনই বলিয়াছিলেন যে, এ পুস্তক যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কবি না হইয়া যান্‌ না। কথাটাকে তখন বিশেষ নির্ভরযোগ্য মনে হয় নাই। তার পরে "কোয়েষ্ট" পত্রে দু একটি করিয়া কবিতা বাহির হইতে লাগিল। সেই কবিতাগুলি ও কয়েকটি নূতন কবিতা একত্র করিয়া একটি নূতন কাব্য অবশেষে আমাদের হাতে আসিয়া পৌঁছিল :— "The creed of my heart"।

ইহার মধ্যে বিশেষত্ব কিই বা আছে! আধুনিক সাহিত্যে কবিগণ ভাষা ও ছন্দের বিন্যাসে যে শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করেন, এ গ্রন্থে তাহার পরিচয় কোথায়? কবিত্বের সম্পদে এই কবি যথেষ্ট পরিমাণে ভূষিত নহেন। ইঁহার কাব্যধারা যে ক্ষুদ্র নির্ঝর হইতে ক্রমশঃ নদীর আকার লাভ করিয়া কলার সংযত তটবন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া সংসারের নানা ঘাটের পরিচয় লাভ

করিবে এবং লোকালয়ের স্তন্যস্বরূপিণী হইয়া আপনাকে ক্রমশই বিস্তীর্ণ ও গভীর করিয়া অবশেষে একদিন সমুদ্রগামিনী হইবে, তাহার আভাস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে নাই। ইহা অরণ্যপর্ব্বতের নির্জ্জনতা-বেষ্টিত একটি ক্ষীণ নির্ঝরধারার মত—হয় ত চিরকালই ইহা সেই ভাবেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু সেই নির্জ্জনতার নিঃশব্দগম্ভীর মহাসঙ্গীত ইহার কণ্ঠে পূর্য্যমান। সেই জন্যই সানন্দে ইহাকে অভিবাদন করিয়া লইতেছি।

আজ এই কাব্যের সর্ব্বপ্রথম কবিতাটি আমার পাঠকগণকে শুনাইয়া আমি বিদায় লইব। এই কবিতাটির নামেই গ্রন্থখানির নামকরণ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহার পরিচয় পাইলেই গ্রন্থখানির অন্তরে প্রবেশ লাভ হইবে।

কবি বলিতেছেন, সংশয়ের ঝড়ের অন্ধকার রাত্রে কি উতরোল ক্রন্দন ধ্বনি, প্রাণের মধ্যে ফিরিতেছিল—কেন এই জীবন? কিসের জন্য এই জীবনব্যাপী পরিশ্রম ও দুঃখভোগ? দুদিনের এই জীবন, তার পর তো মৃত্যুর অন্ধকার—এত দুঃখ বেদনার ফল কোথায়, এ পরিশ্রমের সার্থকতা কে লাভ করিবে? তবে কি দৈবই আমাদের নিয়ন্তা এবং আমরা কতগুলি মুগ্ধ স্বপ্নের দ্বারা প্রতারিত হইয়া আছি? কাহারো ইচ্ছা যে আমাদিগকে সৃজন করিয়াছে এ কি তবে মিথ্যা এবং কোন প্রেম যে আমাদিগকে একদা উদ্ধার করিয়া সার্থক করিবে এও কি মিথ্যা? অণুপরমাণুর সংঘাতেই কি জীবের জন্ম এবং মৃত্যুর পর কি আমরা ধূলা মাটী হইয়া যাই?—কিন্তু কি আশ্চর্য্য যে এই প্রশ্নের সুরগুলি কালো মেঘের মত দীর্ঘ রজনী ধরিয়া গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিলেও প্রভাতের বিমল নিঃশ্বাস লাভ করিবা মাত্র কোথায় মিলাইয়া গেল! দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনে কাহার অদৃশ্য হাত একটি সোনালী সবুজ পাড় বুনিয়া দিল।

সঙ্গীতের চেয়েও গভীরতর একটি স্তব্ধতা, একটি বলিষ্ঠ ব্যগ্র প্রতীক্ষার স্তব্ধতার বেষ্টনে সমস্ত দিক্‌ বিধৃত হইল—কেবল নদীর অস্ফুট কলধ্বনি, বৃক্ষরাজির ক্ষীণ মর্ম্মর বায়ুর স্রোতে ভাসিয়া আসিয়া দূরদূরান্তরে বিলীন হইয়া গেল। সংশয়ের অন্ধকার রাত্রি আর নাই, আশার উদার আলোকে দীপ্যমান আনন্দময় প্রভাত সমুপস্থিত। সেই প্রভাতের আনন্দনিঃশ্বাসে হৃদয়ের মধ্যে এমন অভূতপূর্ব্ব আবেগের সঞ্চার হইল যাহা সকল আবেগকে ছাপাইয়া যায়। সকল আনন্দের বাড়া আনন্দ, সকল বাসনার ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত সমুজ্জ্বল আশা, সকল বিশ্বাসকে আচ্ছন্ন করিয়া এক বিশ্বাস, তেজোময়ী অমৃতময়ী অগ্নিশিখার মত এক প্রেম জাগ্রত হইয়া হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া, জীবনকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া, সকল ভাবনাকে মুছিয়া সকল ধ্বনিকে নীরব করিয়া সকল সংশয় ও প্রশ্নকে বিলীন করিয়া দিল। রহস্যকে আর কোথায় অন্বেষণ করিতে যাইবে? তাহা যে প্রত্যক্ষ—তাহা যে ঐ—ঐ প্রভাতের প্রদীপ্তিতে, ঐ মুখর নীরবতায়, ঐ আনন্দোচ্ছ্বাসে, এই নর্ত্তমান হৃৎপিণ্ডে। ইন্দ্রিয়পটে যে সকল চিত্র প্রভাতের অভ্যুদয় কালে বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত হইয়াছিল, চকিতের মধ্যে তাহারা সকল ভেদ বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড সত্তার বোধে সমস্ত চৈতন্যকে তরঙ্গিত করিল।

এই অদ্বৈতানন্দে ভরপুর হইয়া কবি বলিতেছেন, আমি বিশ্বাত্মার সহিত এক; আমি আর আমার পরিমিত জীবনটুকুর মধ্যে আবদ্ধ নহি, আমি সেই অখণ্ড জীবন্ত একের মধ্যে সঞ্জীবিত। আমি আমার অহং-এর চেয়ে বড়, আমি এখন অহংশূন্য আমি. আমার অস্তিত্বের উৎস ঐ পূর্ব্বাকাশের অরুণ দীপ্তির মধ্যে। আমার জীবনকে আমি হারাইয়াছি বটে কিন্তু সেই একের মধ্যে সেই অখণ্ড জীবনের মধ্যে তাহা যে নব জন্ম লাভ করিয়াছে। সমস্ত কালের বাধা দেশের

বাধা দূর হইয়া গিয়া চিন্তার বিদ্যুৎ চমকে অনন্ত আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি চকিত হইতেছি। আমার এই বক্ষের মধ্যে সমস্ত জগৎ; তাহার অপরিমেয় গতি ও অতলস্পর্শ শান্তির নাড়ী আমারি বক্ষের মধ্যে নর্ত্তিত হইতেছে। এ কিসে আমি স্পন্দমান—একি গতিতে না বিরতিতে? একি বিদ্যুতের খরদীপ্তি না চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধতা? কি যেন আমি জানি না, কিন্তু আমার ঊর্দ্ধে নিম্নে চতুর্দ্দিকে বিশ্বধারা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে—প্রাণের ধারা, প্রেমের ধারা। সেই পূতনির্ম্মল ধারায় সকল আবেগ তরঙ্গিত, তাহার নীরবতায় সকল সঙ্গীত মুখরিত। সৃজনের আদি উৎস হইতে প্রেমের অতল গভীর সমুদ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত সেই ধারা। আমার প্রাণ সেই অনন্ত প্রাণপ্রেমধারার মধ্যে বিলীন হইয়াছে।

কবিতাটি পড়িতে পড়িতে একটি প্রশ্ন মনে জাগে, ইংরেজী কবিতায় এই উপনিষদীয় অদ্বৈতানন্দ আর কি কোথাও দেখিয়াছি? দেখিয়াছি বৈ কি—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতায়। কিন্তু তাহার সঙ্গে এ কবিতার পার্থক্য যথেষ্ট। এ কবিতার প্রেরণা উপনিষদ হইতে—যে ঋষিকবিগণ সমস্ত আকাশকে আনন্দ সমস্ত বিশ্বকে আত্মারূপে অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত সাহসের সঙ্গে অনুভব করিয়াছিলেন, সেই তাঁহারাই ইহার উদ্বোধক। তাঁহারা আর বাহিরকে বাহির এবং অন্তরকে অন্তর বলিয়া ভিন্ন করিয়া দেখেন নাই। আকাশে যিনি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সকলি জানিতেছেন, অন্তরে তিনিই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সকলি জানিতেছেন—সেই একের আনন্দে ঊর্দ্ধ অধ দক্ষিণ পশ্চাৎ অন্তর বাহির ভূত ভবিষ্যৎ দেশ কাল জীবন মৃত্যু সমস্তই পরিপূর্ণ। এই অদ্বৈতকে নামরূপবিহীন নিরুপাধিক বস্তু বলিয়া ধারণা করিবার কোন কথাই নাই। সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের মধ্যে সমস্ত জীবনের মধ্যে যাহা কিছু

আছে বা হইবে সকলের মধ্যে অত্যন্ত ধ্রুব, অত্যন্ত নিকট, অত্যন্ত আত্মীয়, একমাত্র চরম ও পরম ও আনন্দময় বস্তুরূপে অদ্বৈতের উপলব্ধি হইবে। ইহা পশ্চিমে কোথায় দেখা গিয়াছে? প্লেটোর ভাববাদে ইহা নাই। প্লেটোর প্রধান কথা এই যে, জগতের রূপ এক অবিনশ্বর অরূপ সৌন্দর্য্যের প্রতিভাতি মাত্র—সকল পার্থিব রূপের মধ্যে সেই পরিপূর্ণ রূপের আভাস পড়ে। কিন্তু প্লেটো বলেন যে সেই পরিপূর্ণ রূপ বাস্তব জগতে কোথাও নাই—তাহা আইডিয়ার লোকে আছে। ইংরাজ কবিগণের মধ্যে শেলির কাব্যে প্লেটোর এই ভাববাদের প্রভাবের পরিচয় লাভ করা যায়। কিন্তু কোথায় সেই পরিপূর্ণতার বাণী কোথায়? যে বাণী বলে এষহ্যেবানন্দয়াতি—এই—এই যাহা কিছু দেখিতেছি শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি সমস্তই সেই চরম আনন্দ! যদিদং কিঞ্চ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং—যাহা কিছু আছে সমস্তই প্রাণে কম্পিত হইতেছে—সেই বিরাট্‌ বিশ্বপ্রাণের বার্ত্তা কোথায়?

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থে সেই বাণী আছে বলিয়া আমরা অনেক সময় আমাদের মনকে ভুলাইয়া থাকি—বলি, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ভারতীয় ঋষি কবিদের মত। কিন্তু ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যে দ্বন্দ্বমূলক ধর্ম্মনীতির প্রভাব ছাড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই, তাঁহার কাছে বিশ্বপ্রকৃতি যে নিয়মরূপিণী বলিয়াই আনন্দদায়িনী ছিলেন এবং নিজের জীবনকেও যে নানাপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া নিয়মবন্ধনে কঠোর করিয়া বাঁধিবার দিকেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের চিরজীবনের সাধনা নিয়োজিত ছিল, আমরা সে কথা ভুলিয়া যাই। ধর্ম্মনীতির প্রভাব অতিমাত্রায় স্বীকার করিবার জন্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মধ্যে সেই পরিপূর্ণ একাত্মকতা সেই রসময় অদ্বৈতানুভূতি তেমন একান্ত ভাবে জাগিতে পারে নাই, যেমন প্রাচীন উপনিষদের ঋষিদের মধ্যে

জাগিয়াছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যেন বরাবর দর্শক—প্রকৃতির রঙ্গভূমির এক প্রান্তে আসীন মাত্র। কারণ নীতিবোধের দ্বৈত—ভালমন্দ পাপপুণ্যের দ্বৈত—তাঁহার চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল।

ব্লেকের কবিতায় নিম্নলিখিত কয়েকটি ছত্রে যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পাইয়াছে ঃ—

To see a world in a grain of sand,
And Heaven in a wild flower,
Hold infinity in the palm of your hand
And eternity in an hour.—ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের কবিতায় তাহার গন্ধমাত্র নাই। তাঁহার কাছে ফুল—'thoughts that do often lie too deep for tears'—'চিন্তা' আনে এবং সকল সময়ে সে সকল 'চিন্তার' সঙ্গে অশ্রুজলের সম্পর্কও থাকে না। ফুলের ভিতরে কি 'মর‍্যাল' বা নীতিকথা পাওয়া যায়, ইহাই হয়ত সেই 'চিন্তার' মর্ম্ম হয়। সকল সীমার মধ্যে অসীমতা বিরাজিত—এ ভাব বরং মধ্যযুগের কোন কোন খৃষ্টীয় সাধকের বাণীর মধ্যে ফুটিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যেও সীমা-অসীমতার দ্বন্দ্ব দূর হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু প্রসঙ্গক্রমে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিলাম তাহা হইতে এড্‌মণ্ড হোল্‌ম্‌সের কবিতাকে আমি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের কবিতার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর স্থান দিতেছি একথা যেন কেহ মনে না করেন। কারণ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের বাণী সম্পূর্ণরূপে স্বকীয়—তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টির জন্য, তিনি বিশেষভাবে কাহারও নিকটে ঋণী নহেন। এড্‌মণ্ড হোল্‌ম্‌স্‌ যে বৌদ্ধ সাধনা ও তত্ত্ব এবং বিশেষভাবে উপনিষদের নিকট ঋণী, তাহা তাঁহার এই কাব্য পাঠ করিলে পরিষ্কার বুঝা যায়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার কাব্যের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়। কারণ, প্রাচ্য

অধ্যাত্ম বাণীকে তিনি আপনার জীবনের রসে রসাইয়া লইয়া আপনার জীবনের বিশেষ বাণীরূপেই প্রকাশ করিতেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে যতই তাঁহার জীবনের পরিধি ব্যাপকতর হইবে ও তাঁহার রসানুভূতি গভীরতর হইবে ততই অন্য সকল বাণীর প্রতিধ্বনি তাঁহার কাব্যে ক্ষীণতর হইয়া আসিবে এবং ক্রমে ক্রমে তিনি আপনার রূপে আপনি প্রকাশ পাইবেন এবং আপনার বাণীতে আপনি "কৃতার্থ" হইবেন।

যে কবিতাটির সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি তাহারি মধ্যে এইরূপ আশা করিবার যথেষ্ট হেতু লাভ করিয়াছি। তাহার প্রথম অংশে (অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত আমরা শুনিয়া আসিয়াছি) আমাদের দেশের প্রাচীন বাণীর প্রতিধ্বনি পাই, কিন্তু তাহার শেষ অংশে কবির আপনার হৃদয়ের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। কবি বলিতেছেন:—হে বিশ্বপ্রকৃতির আত্মার আত্মা, পৃথিবীর সাধুরা তোমাকে নানা সাধনার দ্বারা ও কষ্টসাধ্য পরিশ্রমের দ্বারা লাভ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমার অন্তরে কেবল মুহূর্ত্তমাত্রের জন্য তোমার মুখ চমকিয়া জাগিয়াছে। সে মুহূর্ত্ত তো মুহূর্ত্ত নয়, সে মুহূর্ত্ত যে কালহীন কালের এক অণু—সে যে আমার চিরন্তন মুহূর্ত্ত। কত যুগ যুগ ধরিয়া তোমার প্রেমের আহ্বান আসিয়াছে। সমুদ্রের বক্ষ হইতে নিঃশ্বসিত বাষ্পের মত—কবে জানি না—আমি তোমা হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি কিন্তু জানি সেই বাষ্প নদীতে বর্ষিত হইবে এবং নদী একদা সমুদ্রে তাহার অবসান লাভ করিবে। একদিন এমনি করিয়াই সমস্ত জীবনচক্র পূর্ণ হইবে, পথের পথিক গৃহপ্রত্যাগত হইবে। আমি কেন যে তোমা হইতে আসিয়াছি তাহা কি জানি, কিন্তু হে ঈশ্বর! তুমি যাহা তুমি তো তাহাই আছ—এই অনন্তকালের জীবনযাত্রার পূর্ণতা সে যে তোমারি স্পন্দমান হৃৎপিণ্ডের

নর্ত্তন। তোমার হীনতম জীবকেও তোমার প্রয়োজন আছে—যাহা এক কালে তোমার ছিল তাহাকেই তোমার প্রয়োজন আছে এবং আজ যে তৃষ্ণা আমার হৃদয়কে সন্তপ্ত করিতেছে সে যে আমারি হৃদয়ের জন্য তোমারই তৃষ্ণা। আমার ইচ্ছা যতই কেন বিদ্রোহী হইয়া তোমার সর্ব্বগত পরিপূর্ণ ইচ্ছাকে অস্বীকার করুক না, তথাপি যুগ যুগ ধরিয়া কত জীবনের মধ্য দিয়া তুমি ক্রমাগতই আমাকে আকর্ষণ করিবে—লজ্জা দুঃখ বেদনা মৃত্যু এবং ধ্বংস হইতে তুমি আকর্ষণ করিবে—নরক হইতে স্বর্গে, রাত্রি হইতে দিবসে, অহঙ্কারের গভীরতা হইতে নিরহঙ্কার পবিত্রতাতে, হে জীবন-উৎস! তুমি একান্ত ধৈর্য্যশীল প্রেমে আমাকে আকর্ষণ করিবে।

তোমার অকূল সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত বিলুপ্ত হইতে কি আমি ভীত হইব? যে পীড়িত সে কি সুখী হইতে ভয় পায়? যে বন্দী সে কি মুক্ত হইতে ভয় পায়? তোমার প্রসন্নতার উদার দীপ্তিতে যখন পর্ব্বতশিখর প্রভাতে অগ্নিময় হইয়াছিল তখন কি আমি ভীত হইয়াছিলাম? সেই নিবিড় মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ের আলিঙ্গনের যে অনির্ব্বচনীয় পুলক আমাকে স্পন্দিত তরঙ্গিত করিয়াছিল, তখন কি আমি ভীত হইয়াছিলাম? আমার জীবন তোমার অনন্ত জীবনের তরঙ্গরাজির নিম্নে যদি নিমজ্জিত হয়, তবে সেই গভীর অতলতায় আমার নিত্য সত্যকে সাক্ষাৎকার করিতে আমি কেন ভীত হইব? * * * আমার কোন ভয় নাই। আমি জীবনের রহস্য অনুমান করিয়াছি, আমি মৃত্যুর অর্থের পরিমাপ করিয়াছি। পাপের সমস্যারও সমাধান আমি লাভ করিয়াছি; আমি জানি যে কোন হৃদয় কোন দুঃখ বৃথা ভোগ করে নাই, কোন প্রয়াসে বৃথা প্রয়াসী হয় নাই।

* * * * *

আমার মনে হয় যে কবিতাটির এই শেষ অংশের মধ্যে ক্রীড্‌ অব্‌ বুদ্ধ এবং ক্রীড্‌ অব্‌ ক্রাইষ্ট * এই উভয়ের মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মজন্মান্তরবাদ এবং নির্ব্বাণলাভ না করা পর্য্যন্ত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের কথা ইহার মধ্যে আছে বটে কিন্তু নির্ব্বাণ এই কবির কাছে শূন্যতা নহে। নির্ব্বাণ—আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্পূর্ণ যোগ—অর্থাৎ উপনিষদের যাহা কথা। কিন্তু সে যোগ কি ভাবে উপলব্ধ হইবে ?—বৌদ্ধদের সাধনা অবলম্বন করিয়া ? অর্থাৎ কেবলি ঋণাত্মক দিগের সাধনা অবলম্বন পূর্ব্বক বাসনাকে ক্ষয় করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত থাকিয়া ও সংসারে বিরাগী হইয়া কি সে যোগ উপলব্ধি করা যাইবে ? না। সমস্ত জগৎকে জীবনকে ঈশ্বরের প্রেম বলিয়া বুঝিতে হইবে—অন্তর সেই প্রেমরসে অভিষিক্ত হইলে তখনি এক মুহূর্ত্তেই সমস্ত রহস্য অনাবৃত হইবে, প্রেমস্বরূপ একেবারে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ও দীপ্যমান হইবেন।

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছ নীচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।—

"The thirst that consumes my spirit is the thirst of Thy heart for mine" :—

হোল্‌ম্‌সের কবিতার এই সুর উপরে উদ্ধৃত বাংলা শ্লোকটির সুরের সঙ্গে মেলে। এই সুরটিকেই হোল্‌ম্‌সের কাব্যের বিশেষ সুর বলিয়া আমি আদর করিতেছি।

* ক্রীড্‌ অব্‌ বুদ্ধ এবং ক্রীড্‌ অব্‌ ক্রাইষ্ট, হোল্‌ম্‌সের এই দুই গ্রন্থে বুদ্ধ ও খৃষ্টের বাণীর নিহিতার্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

উপনিষৎ *

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে বেদ উপনিষদ্ সম্বন্ধে আলোচনা অনেক দিন হইতে চলিতেছে। কিছুকাল হইল, অধ্যাপক পৌল্ ডয়্সন 'The Philosophy of the Upanishads' অর্থাৎ উপনিষদের তত্ত্ব নামক এক বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপ ব্যাপক আলোচনার অভাব এদেশে ছিল। হীরেন্দ্র বাবু তাহা দূর করিয়া প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে উপনিষদের উপরে ব্রাহ্মসাহিত্য ছাড়া দু-একখানি পুস্তক দেখিয়াছি, কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য মনে করি না। কেননা সেগুলি মূলতত্ত্বের দিক দিয়া আলোচনা নয়। সেরূপ আলোচনা করিতে গেলে তত্ত্বের আসল সমস্যাগুলি কি এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাহার সমাধানই বা কিরূপে হইয়াছে তাহার পরিচয় থাকা চাই। নহিলে কেবল কথার জঞ্জালই সৃষ্টি করা হয়, কিছুই জানা যায় না।

হীরেন্দ্র বাবুর গ্রন্থে আমাদের অভাব মোচন হইয়াছে। তিনি যেরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় দুরূহ বিষয় সকলের আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে বাস্তবিকই বিস্মিত হইতে হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের এক একটি দিক্—সগুণবাদ, নির্গুণবাদ, অজ্ঞেয়বাদ ইত্যাদি—এমন করিয়া তিনি আলোচনা করিয়াছেন যাহাতে উপনিষদগুলি নিজেই নিজের কথা বলে, লেখকের ব্যাখ্যার বাহুল্য ঘুচিয়া যায়। বস্তুত উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্বের আলোচনার ভাষা যে এমন আশ্চর্য্য বিশদ হইতে পারে তাহা আমাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

* উপনিষদ্ (ব্রহ্মতত্ত্ব) শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

৫৫ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ হইতে লোটাস্ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অথচ আমাদের দেশের চিন্তাভীরু লেখকদিগের ন্যায় সকল মতামতের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মুখ তাকাইবার কোন লক্ষণও তাঁহার গ্রন্থে দেখা গেল না। তাঁহার আলোচনায় পদে পদে তাঁহার স্বাধীন অনুসন্ধান ও বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

হীরেন্দ্র বাবু বলেন যে প্রাচীন ভারতে জীবনকে যেমন চারি আশ্রমে বিভক্ত করিয়াছিল, চারি আশ্রমের উপযোগী বৈদিক সাহিত্যও তেমনি চারি পর্য্যায়ে বিভক্ত হইয়াছিল। ব্রহ্মচর্য্যের সময়ে শ্রুতি-ধারণ করিতে হইত, গার্হস্থ্যে ব্রাহ্মণোক্ত যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত, অরণ্যে গমন করিলে আরণ্যকগ্রন্থ প্রধান উপজীব্য ছিল এবং শেষ অবস্থায় ছিল উপনিষদ্। এই মত সত্য অথবা ইউরোপীয়দের মত সত্য আমরা তাহার বিচারে অধিকারী নহি। তবে এইটুকু মাত্র বলিতে পারি যে একই সময়ে মন্ত্র, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ্ সমস্তই উৎপন্ন হইয়াছিল এ কথা বলিলে অভিব্যক্তির নিয়মকে অস্বীকার করা হয়। উপনিষদে ক্ষত্রিয় প্রভাব যে বিদ্যমান তাহা লেখক স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন। একদিকে মন্ত্র-ব্রাহ্মণের যাগযজ্ঞ প্রভৃতি ক্রিয়াকাণ্ড, অন্যদিকে উপনিষদের ব্রহ্মবাদ, এই দুই ধারাকে এক ধারা বলিলে চলে না। এই দুই ধারা যে একই কালে উৎপন্ন, ইহাদের মধ্যে পারম্পর্য্য কিছুই নাই তাহা মন স্বীকার করিতে চায় না। অবশ্য, এ কথা সম্ভবপর হইতেও পারে যে, ইহাদের উৎপত্তি-কালের পূর্ব্বাপরতা এবং ইহাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতর অনৈক্য থাকিলেও কোনো বিশেষ একসময়ে আমাদের সমাজে সকলগুলিই সমান শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হইয়াছে, এবং সে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের জন্য বেদের এই ভিন্ন ভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হওয়াতে ইহাদের ভিতরকার বিরোধের একপ্রকার সমাধান হইয়া গিয়াছে। বস্তুত যাগযজ্ঞ ক্ষত্রিয়দের বৃত্তি ছিল না বলিয়াই তাঁহাদের চিত্ত সে দিকে

স্বাধীন ছিল এবং বাহ্য অনুষ্ঠানের জটিল জালের মধ্যে প্রতিহত না হইয়া সহজেই তাঁহাদের চিন্তা ব্রহ্মবিদ্যার মুক্ত আকাশে সঞ্চরণ করিতে পথ পাইয়াছিল এই কথা অনুমান করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে দেখা যায় যে, যে দুইজন মহাপুরুষ লোকপ্রচলিত পন্থাকে অস্বীকার করিয়া উদার ধর্মপথের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই শ্রীকৃষ্ণ ও শাক্যসিংহ উভয়েই ক্ষত্রিয়।

অধ্যাপক ডয়সন্ বলিয়াছেন যে উপনিষদে পরিস্ফুট আকারে আমরা যে সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎকার লাভ করি তাহা দীর্ঘকালব্যাপী অনেক লোকের গবেষণার ফল। ডয়সন্ সেই জন্য উপনিষদের ভিতর হইতে নানা কালের চিন্তার স্তরপর্য্যায় আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন উপনিষদের প্রথম স্তর—নির্গুণ ব্রহ্মবাদ। নেতি নেতি শব্দবাচ্য এক বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় নিরাকার সত্তা আছেন এবং আর কিছু নাই এই তত্ত্ব প্রথমে বৈদিক বহুদেববাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মাথা জাগাইয়া উঠিয়াছিল। তারপর যখন জগতে ও ব্রহ্মে যোগ স্থাপনের প্রয়োজন অনুভূত হইল তখন জগৎ এবং ব্রহ্ম একই—এই মত প্রচারিত হইল। ইংরাজীতে ইহাকে বলে প্যান্থীজম্। ইহাই উপনিষদের দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরে ব্রহ্ম ও জগতের দ্বৈতাদ্বৈত সম্বন্ধ স্থির করা হইল। অর্থাৎ জগতে যদিচ ব্রহ্মের আবির্ভাব আছে তথাপি জগৎকে তিনি বহুগুণে ছাড়াইয়া আছেন। ইংরাজীতে এ মতের নাম থিইজম্। শেষে যখন ব্রহ্মতত্ত্ব একদিকে, সৃষ্টিতত্ত্ব অন্যদিকে স্বতন্ত্র হইয়া দ্বৈতবাদের সৃষ্টি করিল তখনই ঔপনিষদ যুগের পরিণাম এবং সাংখ্য শাস্ত্র প্রভৃতির আরম্ভ।

অধ্যাপক ডয়সন্ অনেক প্রমাণের দ্বারা এই ক্রমবিকাশের স্তরপর্য্যায় উপনিষদের ভিতর হইতে বাহির করিবার বিধিমতে চেষ্টা পাইলেও ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ভাষার বিভেদের প্রমাণের উপর তাঁহার সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় নাই। বিশুদ্ধ অনুমানের উপরই তাঁহার প্রমাণচেষ্টার প্রধান নির্ভর। এ কথা এই জন্য বলিতেছি যে, যে কোন উপনিষদ্ টানিয়া লওয়া যাক্ না কেন তাহার মধ্যে ডয়সন্-কথিত সকল মতবাদই এক সঙ্গে গায়ে গায়ে মিলিয়া আছে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। তাহার মধ্যে সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবাদ উভয়ই আছে—ব্রহ্মে জগতে ভিন্ন কখনো বলা হইতেছে, কখনো বা উভয়ে অভিন্ন বলা হইতেছে। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে উপনিষদ্ তত্ত্বগ্রন্থ নয়, তাহা ঋষিকবিদের উপলব্ধির প্রকাশ মাত্র। তর্কযুক্তির সাহায্যে সত্যকে প্রমাণ করিবার ব্যস্ততা ইহার মধ্যে লক্ষিত হয় না, ইহা শারীরক মীমাংসাও নয়, শ্রীভাষ্যও নয়—একেবারে বিশুদ্ধ উপলব্ধির কথা, সহজ প্রজ্ঞালব্ধ সত্যের সাক্ষাৎ পরিচয়ের কথা। সুতরাং তাহার মধ্যে সকল মত-বৈচিত্র্যেরই অদ্ভুত সামঞ্জস্য আছে। জীবনের মধ্যে যেমন বিচিত্র বিরুদ্ধ জিনিসের মিল ঘটে তেমনি নানা বিরুদ্ধ মতামত এই উপনিষদের মধ্যে মিলিয়াছে। উপনিষদ্ যদি দর্শনশাস্ত্র হইত তবে তাহাকে তর্কের চুলচেরা পথে চলিতে হইত এবং তাহা হইলেই যাহা অখণ্ড উপলব্ধির জিনিস তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া পরস্পর যুঝিয়া মরিত।

হীরেন্দ্র বাবু যদিচ ডয়সনের মতের সমালোচনা কোথাও করেন নাই তথাপি তাঁহার গ্রন্থে আমরা এই ভাবেরই সাক্ষ্য পাইয়াছি। তাঁহার আলোচনাকে এক প্রকার ডয়সনের আলোচনার প্রতিবাদ বলিলেও চলে। কারণ তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন যে সগুণ ও নির্গুণ,

এই দুই কোটির মিলই উপনিষদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। উপনিষদ্ যে দর্শনশাস্ত্র বা ভাষ্যমাত্র নয়, তাহা যে আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর হইতে উপলব্ধ অখণ্ড সত্যের সাক্ষাৎকারের কথা, তাহাও তিনি একাধিক স্থানে অসঙ্কোচেই বলিয়াছেন।

কিন্তু এখানে একটি কথা আমাদের জানাইতে হইতেছে। লেখক উপনিষদের মতের সহিত থিয়সফির মতকে মিলিত করিবার জন্ম আগ্রহান্বিত দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম। তিনি সূক্ষ্ম শরীর স্থুল শরীর প্রভৃতি সম্বন্ধে থিয়সফিকথিত সংস্কারগুলিকে উপনিষদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। হইতে পারে যে ও সকল গুহ্যতত্ত্বও উপনিষদের ভিতরে কোন না কোন আকারে নিহিত ছিল; কারণ, থিয়সফি তো মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার বহির্ভূত জিনিস নয়; থিয়সফির মূল কত কালের কত গুহ্য সাধনার মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তবে ইহাতে অনিষ্ট হয় এই যে, গোড়াতেই যে পাঠকেরা আধুনিক সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের প্রতি আস্থাবান্ নয় তাহারা একদিকে তাঁহার যুক্তি ও অপরদিকে তাঁহার সংস্কারের ঘাতপ্রতিঘাতে পীড়া বোধ করিতে থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। আধুনিক জীববিজ্ঞানে বলে যে যদিও কোষাণুর (cell) সমষ্টি মিলিয়া স্থুল শরীর নির্ম্মিত হইয়াছে তথাপি প্রত্যেক কোষাণু এবং তাহার সূক্ষ্মতম ভাগের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। লেখক এই কথাটাকে লইয়া উপনিষদের "বিরাট" ও "হিরণ্যগর্ভ" এ দুয়ের প্রভেদ বুঝাইলেন এইরূপ:—কোষাণুর সমষ্টিসমন্বিত স্থুল শরীরের মত ব্যষ্টি স্থুল দেহের যে সমষ্টিমূর্ত্তি তাহারই নাম "বিরাট" এবং প্রত্যেক কোষাণুর সূক্ষ্ম অস্তিত্বের ন্যায় সূক্ষ্মব্যষ্টি যে সমষ্টি শরীর ধারণ করে তাহারই নাম "হিরণ্যগর্ভ"। এই সূক্ষ্মব্যষ্টির শরীরই মহাত্মাগণ কালে কালে পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাই তাঁহাদের উপলব্ধি সূক্ষ্মতর হইয়া থাকে।

এ সকল মতবাদের স্বতন্ত্র স্থান থাকিতে পারে কিন্তু উপনিষদের মত-ব্যাখ্যার সহিত ইহাদিগকে জড়িত করা আমরা সঙ্গত মনে করি না।

এটুকু দোষের কথা ছাড়িয়া দিলেও পুস্তকখানি যে অতীব উপাদেয় হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লেখকের প্রধান বক্তব্য বিষয় এই যে, ব্রহ্মতত্ত্বের যে দুইটি দিক্ উপনিষদ্ স্বীকার করিয়াছেন—একটি জীবাত্মার দিক্ বা সীমার দিক্ এবং অপরটি পরমাত্মার স্বরূপের দিক্ বা অসীমের দিক্—এবং এ দুয়ের যে অভিন্ন যোগের কথা উপনিষদ্ পুনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন ইহাতেই উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব এমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

ব্রহ্ম যেখানে আপনাতে আপনি, সেখানে তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় ও সকল গুণাতীত; কিন্তু যেখানে তিনি বিশ্বের মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন সেখানে তিনি সর্ব্বেন্দ্রিয়-গুণাভাস, চিদ্‌ঘন ও আনন্দময়। অর্থাৎ সত্তা এবং প্রকাশ, ভাব এবং রূপের যে দ্বন্দ্ব আমাদের মধ্যে আছে তাহা তাঁহার মধ্যে নাই। আমাদের বুদ্ধি সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া আমরা নিত্যকে এবং অনিত্যকে সীমাকে এবং অসীমকে একই সময়ে উপলব্ধি করিতে পারি না, সেই জন্য আমাদের বুদ্ধি কল্পনা করে যে এ দুই বুঝি বাস্তবিক বিচ্ছিন্ন। এ দ্বৈত কেবল আমাদের বুদ্ধির কাছে। অথচ আমরা ইহাও বুঝি যে আমাদের বুদ্ধি যদি সীমা-পরিচ্ছিন্ন না হইত তবে এ দ্বৈত তাহার মধ্যেও থাকিত না। সেই জন্য উপনিষদ্ ব্রহ্মের মধ্যে এ দ্বৈতের অবসান আছে এ কথা যেমন বলিয়াছেন, তেমনিই সজোরে বলিয়াছেন যে বুদ্ধির দ্বারা তিনি গম্য নহেন। তাঁহাকে জানা যায় না, কিন্তু তাঁহাকে একরকম করিয়া উপলব্ধি করা যায়। তিনি অন্তরে "অন্তর্য্যামী" বাহিরে "মহেশ্বর," বিশ্বাভিব্যক্তিতে "বিধাতা" অথচ "বিশ্বাতিগ"। সুতরাং

উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব কোনদিনই বিশুদ্ধ প্যান্‌থিইজম্‌ও নয় বিশুদ্ধ আইডিয়ালইজম্‌ও নয়।

পরিশেষে একটি মাত্র কথার উল্লেখ করিয়া আমরা এ আলোচনা বন্ধ করিব। সেটি "প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি"র তত্ত্ব। উপনিষদের মধ্যে লেখক এই তত্ত্বটিকে স্পষ্ট করিয়া আবিষ্কার এবং ইহাকে বিশদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এ জন্য আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ আছি।

প্রধান বলিতে প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ বলিতে পুরুষকে বুঝায়। সাংখ্যের দ্বৈতবাদের উৎপত্তি যে ঐ তত্ত্বে তাহা দেখাই যাইতেছে।

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই প্রকৃতি এবং পুরুষ—একটি ক্ষয়শীল এবং অপরটি অক্ষয়—এ উভয়ই একই সঙ্গে বিদ্যমান—উপনিষদের এই সৃষ্টিতত্ত্বটি খুবই আশ্চর্য্য। আধুনিক বিজ্ঞানের মধ্যে এ কথার আভাস আছে। সমস্ত বিচিত্র বিশ্বশক্তির আমরা একটি ক্ষয়শীল পরিবর্ত্তনশীল রূপ দেখিতেছি, কিন্তু তাহার অন্তরতর রূপটি অক্ষয় অবিনাশী। এই কারণেই শক্তির রূপান্তর ঘটিতেছে কিন্তু বিনাশ ঘটিতেছে না। অর্থাৎ তাহার মধ্যে ক্ষর এবং অক্ষর এই দুই তত্ত্বই একত্র বিরাজ করিতেছে। প্রকৃতিপুরুষের একত্র অবস্থানের এই মূলতত্ত্বটি উপনিষদে কি সাহসের সঙ্গে চিন্তিত এবং ঘোষিত হইয়াছে!

অথচ যিনি প্রধানও নন্ ক্ষেত্রজ্ঞও নন্—দুয়েরই সমন্বয় যাঁহাতে, উপনিষদে তিনিই প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতি বলিয়া কথিত হইয়াছেন। প্রকৃতি এবং তাহার সাক্ষী জ্ঞাতা পুরুষ এ দুইই সেই একের মধ্যে সমাহিত। আধুনিক কালে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধের দিনে এই একের বার্ত্তার জন্য কি প্রাচীন উপনিষদের দিকে দ্বৈতবাদী জগৎকে তাকাইতে হইবে না?

কর্ম্মকথা *

সাধারণত যে সকল পুস্তক চোখে পড়ে, রামেন্দ্র বাবুর "কর্ম্মকথা" যদি সেই শ্রেণীর হইত, তবে যে দিন ইহা হাতে আসিয়াছিল, সেই দিনই ইহার সমালোচনার কাজ সারিয়া ফেলিতাম। কিন্তু গ্রন্থপাঠে কিছু দূর অগ্রসর হইতেই দেখিলাম যে ইহা অলসভাবে চোখ বুলাইয়া পড়িয়া যাইবার মত গ্রন্থ নহে। ইহার পশ্চাতে সুদীর্ঘ কালের সেই উত্তাপ, সেই পেষণ, সেই সাধনার ইতিহাস রহিয়াছে যাহা সহস্রমুখোচ্চারিত ছেঁদো কথার পুনরাবৃত্তির অঙ্গার-কালিমাকে ভাবের জ্যোতির্ম্ময় হীরক-দীপ্তিতে পরিণত করিয়া দেয়।

সেইজন্য রামেন্দ্র বাবুর এই ২১২ পৃষ্ঠার বইখানিতে আমি এমনি ঠেকিয়া গেলাম যে অনেক দিন পর্য্যন্ত এই বইখানির মধ্যে আমি কি যে দেখিলাম তাহা বলিবার কোন ইচ্ছাই আমার হইল না। আমি স্পষ্টই অনুভব করিলাম যে আমাদের সাহিত্যের যে বিশ্ববন্দরটিতে বিদেশের ভাবসম্পদ্ বহন করিয়া বাণিজ্যতরী-সকল আসিয়া লাগিতেছে, এবং এদেশের যুগসঞ্চিত পণ্যসকল আহরণ করিয়া যেখানে বড় বড় মহাজন লেনাদেনা করিতেছেন, মূল্য যাচাই করিতেছেন—ইনি সেই বন্দরটিতে বাস করেন, ইনি সেই বড় মহাজনদের মধ্যে একজন। ইনি বিদেশের ভাবের পণ্যকে অজস্র গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ, মূঢ়ের মত গ্রহণ করেন নাই,—ইনি দর যাচাই করিয়া লইয়াছেন। ইনি শুধু গ্রহণ করেন নাই,

কর্ম্মকথা—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত।

ইনি ভাবের পরিবর্তে ভাবকে আনিয়াছেন। ইঁহার জোর আছে—ইনি স্বাধীন ভাবেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং স্বাধীন ভাবেই বর্জ্জন করিয়াছেন—পরের জঞ্জালকে ঘাড়ে তুলিয়া লইয়া আপনাকে ভারাক্রান্ত করেন নাই। সুতরাং ইঁহার সঙ্গে কোন্ ভাবের কি মূল্য তাহা লইয়া যদি ঝগড়াও করি, তবে তাহাতেও আনন্দ আছে।

এই গ্রন্থে ১১টি প্রবন্ধ আছে এবং গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে প্রবন্ধগুলি গত বিশ বৎসরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে। তথাপি এই প্রবন্ধগুলি এমনি একটি বিশেষ ভাবের ঐক্যসূত্রে গ্রথিত যে ইহাদিগকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা অসম্ভব। এই গ্রন্থে কেবল মাত্র একটি প্রবন্ধ আমার চোখে পড়িয়াছে যাহা এই সূত্রের মধ্যে ধরা দেয় নাই—যাহা বাস্তবিকই স্বতন্ত্র। সেই প্রবন্ধটির নাম "প্রকৃতি-পূজা"।

পাঠকগণ এইবার আমাকে প্রশ্ন করিবেন—সেই ঐক্যসূত্রটি কি? কিন্তু আমি দুএক কথায় তাহার জবাব দিতে চাহি না। কারণ সে সূত্রটি বজ্রসূত্রের মত। তাহা প্রাচ্য সভ্যতার সহিত প্রতীচ্য সভ্যতার প্রবল সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎপন্ন হইয়াছে। এই দুই বিরুদ্ধ সভ্যতার বিরুদ্ধ আদর্শের ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে তাহার সৃষ্টি বলিয়া তাহা এমনি কঠিন যে হঠাৎ কোন যুক্তির শাণিত অস্ত্রের দ্বারা তাহাকে ছিন্ন করিবার কল্পনাও মনে আনা সম্ভাবনীয় নহে। তাহা নিজের দেশের শাস্ত্র সমাজ সমস্তকেই এমন বাঁধনে বাঁধিয়াছে, যে, কোথাও অঙ্গুলির সাহায্যে গ্রন্থি খরিবার মত সূক্ষ্ম রন্ধ্রটুকু মাত্র রাখে, নাই। সমস্ত পুস্তকটির পাতায় পাতায় সেই কঠিন গ্রন্থির উপরে হাত পড়ে।

এই কঠিনতা যতই বিস্ময়কর হোক্, ইহাকে জীবনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিতে পারি না। পৃথিবীতে মৃত্যুই কঠিন, জড়ই

কঠিন—কিন্তু জীবন কোন এক জায়গায় বাঁধা পড়িতে চাহে না বলিয়াই, তাহাকে অবিরত চলিতে হয় বলিয়াই, বিধাতা তাহাকে কঠিন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। যে আদর্শ জীবনের আদর্শ, তাহার পরিচয়-লক্ষণ জীবনের মতই হওয়া উচিত। তাহার মধ্যে যে টুকু স্থিতির কথা আছে, সেটুকু গতিকে ছন্দিত করিবার জন্য, গতিকে ব্যাহত করিবার জন্য নহে। পাষাণকঠিন পর্ব্বত যেমনি উত্তুঙ্গ হৌক্ না, নদীপ্লাবনে তাহাকে এক মুহূর্ত্তে দীর্ণ বিদীর্ণ করিয়া দিতে পারে। ঠিক্ সেইরূপ স্থিতির আদর্শ, বন্ধনের আদর্শ যতই নিশ্চল, ধ্রুব ও শান্তিময় বলিয়া প্রতীয়মান্ হৌক্, জীবনের একটি তরঙ্গ-অঙ্গুষ্ঠের আঘাত সহিবার শক্তি তাহার নাই। মানুষের প্রাণ-শক্তি যদি এইরূপ অপরাজিত না হইত, তাহা হইলে মানুষের অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, মানুষের সমাজ তাহাকে কোন্ কালে জড়পিণ্ডের সঙ্গে সমান করিয়া রাখিয়া দিত।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার মুখে এ-সকল কথা কোন কালেই রুচিরোচন হয় না। নদীর একদিকে যেমন ভাঙে এবং অন্য দিকে চড়া পড়ে, সেইরূপ অধুনা আমাদের সমাজে বাহির হইতে প্রবল আঘাত আসিয়া সমস্ত ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, তাই আমাদের সমাজ আপনাকে বাঁচাইবার জন্য গতির মুখেই নিশ্চলতার চড়া বাঁধিবার উপক্রম করিতেছে। তাহাতেও যদি না কুলায়, তবে কৃত্রিম বাঁধ দিয়াও নদীবেগকে রুদ্ধ করিবার প্রস্তাব উঠিবেই। কারণ ভাঙিবার বেগ যত প্রচণ্ড, বাঁধের কঠিনতা ততই সুদৃঢ় না হইলে তাল রক্ষা হইতে পারে না। কিন্তু এই আঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে সত্যের চেহারাটা ক্রমশই অন্তর্ধান করিতে আরম্ভ করে। যে বাস্তব বোধ জীবনের একেবারে মর্ম্মগত জিনিস—জীবন যখন রুদ্ধ হয়, তখন দেখিতে দেখিতে তাহারও বিকার ঘটিতে থাকে।

কেবল যে প্রতিক্রিয়ার তাড়নায় আমরা সত্যকে ঠিক-মত দেখিতে পাইতেছি না আমি তাহা মনে করি না। তাহা একটা বড় কারণ। কিন্তু তাহার চেয়েও বড় কারণ আছে। আমাদের দেশে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আমরা আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র পাই নাই বলিয়া বাস্তবের বোধটা আমাদের একেবারেই ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। এইজন্য ধর্ম্মে বল, সমাজে বল—যেখানেই আমরা যে কোন তত্ত্বকে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করি না কেন, সেখানেই এমন কথা বলিয়া বসি যাহা চূড়ান্ত হইতে পারে, কিন্তু যাহা অস্বাভাবিক, মানবপ্রকৃতিবিরুদ্ধ, অব্যবহার্য্য এবং সর্ব্বতো-ভাবেই কাল্পনিক। ধর্ম্মব্যাপারে যেমন সমত্ববুদ্ধির কথা—সুখ-দুঃখকে সমান জ্ঞান করা, সকল ভূতকে সমান জ্ঞান করার উপদেশ। এ যে সমত্ব এ সমস্ত বিশেষত্বকে লোপ করিয়া দেয়, এ ঐক্যতত্ত্বে যথার্থ ভেদের কোন স্থানই নাই। আমি সুখও অনুভব করিব না, আমি দুঃখও অনুভব করিব না—আমি "সুখ-দুঃখবিনির্ম্মুক্ত" কি একটা অদ্ভুত অবস্থা প্রাপ্ত হইব—ইহা এমনি একটা কাল্পনিক কথা যে রামেন্দ্র বাবুর মত লেখক যখন তাঁহার প্রথম প্রবন্ধেই ইহাকে ব্যাখ্যা করিতে বসিয়া সেই সঙ্গে লিখিতেছেন "এই মুক্তিবাদ ভারতবর্ষে জনসমাজকে গঠিত, নিয়মিত ও চালিত করিয়াছিল'' তখন এই কথাই ভাবি, যে, এ মুক্তিবাদের মধ্যে 'নিয়মিত' করিবার আয়োজন থাকিতে পারে, কিন্তু 'চালিত' করিবার আয়োজন কোথায়? সমস্ত সমান কর বলিলে কোনো কথাই বলা হয় না। এই কথাই বলা চলে যে সমস্তই আধ্যাত্মিক পরশপাথরের স্পর্শে রূপান্তরিত কর, সোনা করিয়া দাও। সুখকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়ো না, দুঃখকে একান্ত করিয়া তুলিয়ো না—একটি অখণ্ড পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে যদি সব সুখ দুঃখ ধরা

দেয়, তবে সমস্ত জীবন এমন একটি আশ্চর্য্য সঙ্গীতের মত হয় যাহার মধ্যে বেসুরাগুলাও সুরের অঙ্গীভূত হইয়া উঠে। সর্ব্বভূতকে সমান দেখ—ইহাও বলিলে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। কারণ একটা ফুলও আমার কাছে যেমন মূল্যবান একটা প্রস্তরও সেইরূপ—ইহা বলিলে সমস্ত জিনিসের মূল্যকে একেবারে অস্বীকার করা হয়। এই কথাই বলা উচিত যে একটি অসীম আনন্দের মধ্যে সৌন্দর্য্যের মধ্যে কল্যাণের মধ্যে সত্যের মধ্যে যদি সমস্ত ভেদকে স্থাপন করিয়া দেখিতে পারি, তবেই দেখিব যে অসুন্দরও সুন্দর হইয়া উঠিবে, অকল্যাণ কল্যাণে পরিণত হইবে, অসত্য সত্যে বিলীন হইবে। অর্থাৎ ভেদকে বিলুপ্ত করিয়া যে অভেদ, সে একটা দার্শনিক সংজ্ঞা মাত্র—তাহাকে লইয়া জীবনের কোন ব্যবহার চলে না। ইহার জন্য কোন তর্কের অবতারণার আবশ্যকতা দেখি না—সমত্ববোধই যদি আমাদের দেশের মুক্তিতত্ত্ব হয় তবে সমাজে বিষমত্বের বিষ এমন প্রবল আকারে প্রকাশ পাইল কেমন করিয়া? তত্ত্বে ভেদকে মানিনা কিন্তু ব্যবহারে মানি—এ অসঙ্গতিকে কোনো সূক্ষ্ম যুক্তির আবরণে বাঁচাইবার চেষ্টা মাত্র করা হাস্যকর।

ধর্ম্মের প্রসঙ্গে যেমন আমরা পরিমাণবোধ হারাই—আমরা মানবপ্রকৃতিকেই অস্বীকার করিয়া বসি, আমরা এমন কথা বলি যাহা আমাদের সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধ, আমাদের সমস্ত আচরণ যাহার প্রতিবাদী, ঠিক সেইরূপ সমাজের কথা বলিতে গেলেও সেই একই কাণ্ড ঘটে। আমরা বলি, যে-সমাজে "ব্যক্তিজীবন সমাজজীবনের অনুকূল, যেখানে প্রবৃত্তি নিরঙ্কুশ নহে, যেখানে নিবৃত্তি প্রবৃত্তিকে নিয়মিত রাখে" সেই সমাজই সবল এবং তাহারই জয় হয়। কারণ সেখানে "জীবনের পরিধি প্রসার লাভ করে; জীবনের আয়তন বর্দ্ধমান হয়। * * * এবং

নিবৃত্তিই ক্রমশঃ প্রবৃত্তিতে পরিণতি লাভ করে।" এ সমস্ত কথাই মানিয়া লইলাম কিন্তু প্রশ্ন এই যে যাহাকে নিবৃত্তি বলা হইতেছে তাহাকে সমস্ত সমাজের মধ্যে জাগাইয়া তুলিবার কি উপায় অবলম্বন করা হইবে? যদি নিয়ম, আচার, অনুষ্ঠান প্রভৃতি বাহ্য ব্যাপারের দ্বারা মানুষকে ধরিয়া বাঁধিয়া নিবৃত্তিমার্গে চালাইবার চেষ্টা করা হয় (আমাদের দেশে যে চেষ্টা এ কাল পর্য্যন্ত অবলম্বিত হইয়া আসিয়াছে), তবে নিবৃত্তির তো প্রবৃত্তি হইয়া উঠিবার কোন সম্ভাবনা থাকে না—তবে যে নিবৃত্তিসাধনা মানুষকে একেবারে কল বানাইয়া ছাড়িয়া দিবে। আমাদের দেশে কি তাহারি চেহারা অত্যন্ত কদর্য্যরূপে আমরা ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র দেখিতে পাই না? আমরা মুখে আস্ফালন করিয়া থাকি যে আমাদের মত 'ধর্ম্মপ্রাণ' জাতি পৃথিবীতে নাই, কারণ দেখ—আমাদের স্নান, পান, আহার প্রভৃতি শারীরিক কর্ম্মের মধ্যেও ধর্ম্মকে আমরা স্বীকার করিয়াছি—কত ধৌতি, শুদ্ধি, আচমন, কতকি অনুষ্ঠান আমাদের সমস্ত কর্ম্মকে কেবলি ধর্ম্মের বন্ধনে বাঁধিয়া কল্যাণের আকর করিয়া তুলিয়াছে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার কোথাও কোন জায়গা মাত্র রাখে নাই। কিন্তু এই 'ধর্ম্মপ্রাণতার' মধ্যে প্রাণ কোথায় দেখিতেছি? 'জীবনের পরিধি' এখানে কোথায় 'প্রসার' লাভ করিতেছে? 'জীবনের আয়তন' কোথায় বর্দ্ধমান হইতেছে? প্রাণের মধ্যে তো অন্তহীন পুনরাবৃত্তি নাই—তাহার যে নব নব লীলা—নব নব রূপ। কোথায় আমাদের সমাজে সেই প্রাণের তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস যাহা শিল্পে সাহিত্যে দর্শনে বিজ্ঞানে নানা ধারায় নৃত্য করিয়া চলিতেছে? যাহার মধ্যে সব জানা শেষ হইয়া নাই, সব কর্ম্মানুষ্ঠান স্থির হইয়া নাই,—যাহা ক্রমাগতই পরীক্ষা করিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে, আঘাত করিতেছে, ভুল করিতেছে এবং এম্‌নি করিয়া সমাজকে সকল

দিক্ হইতে গড়িয়া তুলিতেছে? আমরা আমাদের সমাজে 'ধর্ম্ম-প্রাণতার' কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না, যাহা দেখিতে পাই যদি তাহার কোন নামকরণ করিতে হয় তবে তাহাকে 'ধর্ম্মজড়তা' বলাই উচিত। আমাদের মত এমন ধর্ম্মজড় জাতি পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাওয়া দুর্লভ—কারণ আমরা সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে নিয়মের দ্বারা এমনি করিয়া বাঁধিয়াছি যে মানুষের স্বাধীনতা নামক পদার্থকে সেই নিয়মের চাকার তলায় গুঁড়া করিয়া দিয়াছি। মানুষের স্বাধীন প্রবৃত্তি যদি স্বাভাবিক উপায়ে নিবৃত্তিমার্গে উপনীত হয় তবে তাহা সত্য হয়—তবেই তাহাতে প্রাণ আপনাকে প্রকাশ করে। কিন্তু যদি কৃত্রিম আচারের দ্বারা মানুষকে জবরদস্তি করিয়া নিবৃত্তিসাধন করানো হয় তবে নিবৃত্তিপ্রাণতা ঘুচিয়া গিয়া নিবৃত্তিজড়তাই রাজত্ব করিতে থাকে। মানুষ আর মানুষ থাকে না, সে পাথরের সমান হইয়া যায়। সে তখন জড়তাকেই মুক্তি বলিয়া মনে করে, অভ্যাসের পাকে ঘুরিয়া বেড়ানোকেই মস্ত চলা বলিয়া ভ্রম করে।

কিন্তু এ-সকল কথা কি রামেন্দ্র বাবু অস্বীকার করেন? 'আচার' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আধুনিক কালে আমাদের দেশের সামাজিক আচারগুলি অর্থশূন্য ও অনাবশ্যক। কিন্তু তিনি সেই সঙ্গে একথাও বলিতেছেন:—"যে-সকল পুরাতন অনুষ্ঠান আবহমান কাল হইতে সমাজমধ্যে আচরিত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের সহিত সমাজশরীরের রক্তমাংসের অস্থিমজ্জার এরূপ একটা সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, তাহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া নূতন অনুষ্ঠানের প্রবর্ত্তন সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া বিবেচিত হয় না। পুরাতন মন্দ হইতে পারে, কিন্তু নূতনের ভিতর কি আছে কে জানে? পুরাতনে অর্থ দেখিতে পাইতেছি না; উপযোগিতা দেখিতে পাইতেছি না। ক্ষতি

নাই, এতকাল ত একরকমে চলিয়া আসিতেছে, এখনও চলিতে দাও।”

ক্ষতি নাই ? আচারপরায়ণতা যে আমাদের বুদ্ধিকে নষ্ট করিয়া দিয়াছে, আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্বকে শক্তিকে পঙ্গু করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে দুর্ব্বল করিয়াছে—ইহা কি কোনমতেই অস্বীকার করা চলে ? আমাদের যে চতুর্দ্দিকেই বাধার অন্ত নাই, নিষেধের অন্ত নাই ! তিথি মানি, নক্ষত্র মানি, হাঁচি মানি, টিক্‌টিকি মানি, মনসা শীতলা ওলাবিবি, সব মানি—কি যে মানি না তাহা তো জানি না। সমুদ্রযাত্রার বিধান শাস্ত্রে আছে কিনা—ইহা লইয়া আমাদের দেশে আজিও আলোচনা চলিতেছে। শুদ্ধমাত্র এই ব্যাপারটিই কি কম হাস্যজনক ? পৃথিবীতে জন্মিয়াছি, পৃথিবীর সব স্থান দেখিব—ইহার আবার বিধিই বা কি, নিষেধই বা কি ? অবশ্য আমরা আরামে মনে করিতে পারি যে আমাদের নিরর্থক আচারগুলির মধ্যেও একটা সৌন্দর্য্য আছে, কিন্তু যাহারা বাহির হইতে দেখে তাহারা আমাদের এই ভয় ও মূঢ়তা দেখিয়া না হাসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদের কাছে আমরা স্বপ্নচালিত ব্যক্তির মত (Somnambulist) প্রতীয়মান হই—আমরা যে জাগিয়া আছি এ কথা বিশ্বাস করা তাহাদের পক্ষে শক্ত হয়। সুতরাং আচার মানিলে ক্ষতি নাই, এতকাল যাহা চলিয়া আসিতেছে তাহাকে চলিতে দাও—একথা কখনই মানা চলে না। ক্ষতি সামান্য হয় নাই—আমাদের সমস্ত মনুষ্যত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমাদিগকে কৃত্রিম উপায়ে নিবৃত্তি সাধন করাইতে গিয়া নিরর্থক আচারের বন্ধনে এমনি বাঁধা হইয়াছে যে আমরা বহুযুগ ধরিয়া স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কর্ম্মশক্তিকে একেবারে খোয়াইয়া বসিয়াছি। এই ‘অচলায়তনে’র বেড়া ভাঙিবার ঔৎসুক্যকে রামেন্দ্র বাবু

"কবিসুলভ ভাবপ্রবণতা' বলিয়া যতই নিন্দা করুন্ ইহা ভাঙিয়াছে ভাঙিতেছে এবং ভাঙিবে—কারণ ইহা স্বভাবকে, বুদ্ধিকে, বাস্তব জগৎকে দূরে ঠেলিয়া রাখিয়া জড় অভ্যাসের কারাগারে মানুষকে চিরকালের মত বন্দী করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাহিরের বিশ্বের আক্রমণকে ঠেকাইবার জন্য ইহা প্রাচীর তুলিয়াছে, ভিতরের স্বভাবের স্বতোচ্ছ্বসিত প্রাণকে আনন্দকে ইহা অবিশ্বাস করিয়াছে, বুদ্ধিকে অভ্যাসের শতপাকের ফাঁসিতে মারিয়া ফেলিয়া অন্ধ সংস্কারের ভয়াবহ শাসনকে অদ্বিতীয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। 'নরদেহের অনাবশ্যক বসনভূষণের' সঙ্গে আচারকে তুলনা করিয়া তাহার সমর্থন করা রামেন্দ্র বাবুর ন্যায় সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ লেখকের নিকটে প্রত্যাশিত নহে। অনাবশ্যক ভূষণ যদি প্রাণহন্তা হয়, তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলা আর চলে না, কারণ প্রাণ বাঁচানোটাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

আমি প্রবন্ধারম্ভেই যাহা বলিয়া আসিয়াছি তাহাই আসল কথা—অর্থাৎ আমাদের সমাজের মধ্যে কোন সৃজনী শক্তি নাই বলিয়া, আমরা বড় কর্ম্মক্ষেত্রে সমস্ত জাতি সম্মিলিত হইয়া কিছুই গড়িতেছি না বলিয়া, আমরা সমাজের হইয়া যে ওকালতি করি, তাহা একেবারেই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা হয়। আমরা প্রাচীনের দোহাই দিয়া যে এক আদর্শ সমাজ কল্পনার সাম্‌নে খাড়া করি, বাস্তব সমাজ তাহাকে প্রতিপদেই অপ্রমাণ করিয়া দেয়। আমাদের গতিশক্তিকে যে-সকল কৃত্রিম বাধা অবরুদ্ধ করিয়াছে, আমরা কোন মতেই মানিতে চাই না যে সেগুলি বাধা। কারণ আমরা তো কাজ করি না, কথা কই—সুতরাং বাধা যে বাধা নয় তাহার পরীক্ষা হইবে কি উপায়ে? 'জাতিভেদ' জিনিসটা খুব ভাল, যদি 'বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম' নামক কল্পিত ব্যবস্থার দ্বারা আমাদের বর্ত্তমান

সমাজ বাস্তবিকই চালিত হইত—অর্থাৎ জাতিভেদ যদি সত্য সত্যই বৃত্তিভেদ হইত এবং বৃত্তিভেদের জন্য যদি মনুষ্যত্বের কোন অবমাননা না ঘটিত। কিন্তু কোথায় বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম—কোথায় বৃত্তিভেদমূলক সমাজ-ব্যবস্থা? আজ যদি হাত পা নাড়িয়া আমাদের দেশের সব লোককে একত্রিত করিয়া দেশের কোন মহৎ কাজ আরম্ভ করিতে হয়, তখন কি তাসের কেল্লার মত এই কল্পিত বন্ধন ভাঙিয়া পড়িবে না? তখন জাতিভেদ সত্ত্বেও আমরা এক জাতি, "এক সনাতন ধর্ম্মানুশাসনই হিন্দুর জাতীয়তাকে সহস্র বিপত্তির মধ্যে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে" এই মায়াটা দূর হইতে কি এক মুহূর্ত্তও সময় লাগিবে? হিন্দুর জাতীয়তা লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীকে যে অস্পৃশ্য করিয়া রাখিয়াছে, যাহাদের ছায়া মাড়ানো পাপ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে—জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে তাহাদের আহ্বান করিলে তাহারা এই অপমান এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ভুলিয়া গিয়া "অযোধ্যা মথুরা মায়া হইতে কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা পর্য্যন্ত, পুরী হইতে দ্বারাবতী পর্য্যন্ত সর্ব্ব দেশ" হইতে ছুটিয়া আসিবে, কারণ এখন মূঢ়তাবশত পুণ্যলোভে ঐ সকল তীর্থ স্থানে তাহারা ছুটিয়া যায়? এ-সকল কল্পনা করিয়া খুব আরাম আছে—কিন্তু আমাদের এখন আপনাদের ভুলাইবার আর সময় নাই; অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কাজ আমরা করিয়া আসিয়াছি। আমরা যে কি প্রকারের 'জাতীয়তা' গড়িয়া তুলিয়াছি, তাহা আজ বিশ্ব জগতের সকলেই দেখিতেছে। আমাদের "সেই প্রবল জাতীয়ত্ব কোন বাহ্য শক্তির নিকট অদ্যাপি সঙ্কুচিত বা পরাভূত হয় নাই" ইহা ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বলিলেও স্বীকার করিব না, কারণ সঙ্কোচ এবং পরাভব আমাদের যুগযুগ ধরিয়া ঘটিয়াছে। আমরা জাতি রক্ষা করিয়াছি বলিয়াই জাতীয়তা রক্ষা করিয়াছি,

ইহা সত্য নহে। আমাদের দেশ যখন এক সময়ে সভ্যতার উন্নততম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল. তখন আমাদের সমাজ এমন জাতি-বিচ্ছিন্ন আচারবন্ধনে আবদ্ধ জড় সমাজ ছিল না। মহাভারত পড়িলেই আমরা বেশ দেখিতে পাই যে সমাজের মধ্যে তখন নানা বিচিত্র এবং বিরুদ্ধ শক্তির আঘাত প্রতিঘাত চলিতেছিল, নানা প্রথা ও অনুষ্ঠানের তরঙ্গে সমাজ তরঙ্গিত গতিবেগ লাভ করিয়াছিল—সমস্ত একেবারে চিরকালের মত সংহিতার শিলমোহরের ছাপ লাভ করিয়া স্থির হইয়া যায় নাই। তখনই আমাদের 'জাতীয়তা' প্রকৃত ছিল। কিন্তু আমরা এক সময়ে অনার্য্যজাতি ও বৈদেশিক জাতিদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া অত্যন্ত একটা বিশিষ্টতাহীন একাকারত্বের মধ্যে গিয়া পড়িয়াছিলাম বলিয়া, তাহার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ আমাদিগকে চিরকালের মত এক জায়গায় বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন হইয়াছিল। সেই দিনই আমাদের 'জাতীয়তার' ঐক্য জাতিভেদের দ্বারা শতধা বিচ্ছিন্ন খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বিনষ্ট হইয়া গেল। এখন আমাদিগকে যদি পুনরায় 'জাতীয়তা' গড়িয়া তুলিতে হয়, তবে শুদ্ধ মাত্র হিন্দু উপকরণে গড়া সম্ভবপর হইবে না। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতিকে এক ঐক্যসূত্রে বাঁধিতে হইবে, ভারতবর্ষের জাতীয় মন্দির নানা জাতির নানা মালমসল্লার সাহায্যে গাঁথিতে হইবে। কারণ যে ভেদের উপরে জাতিতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত. সেই ভেদই যে 'জাতীয়তার' প্রাণসংহারক—সেই ভেদ দূর করিতে হইলে ভিত্তিকে প্রশস্ততর করিতেই হইবে। এ কথা যতদিন পর্য্যন্ত স্বাদেশিক সংস্কারে বদ্ধ থাকিয়া অস্বীকার করিব. ততদিন আঘাতের পর আঘাত, বিনাশের পর বিনাশ, আমাদের দেশের ভাগ্যে চির বর্ত্তমান।

রামেন্দ্র বাবু তাঁহার সমস্ত গ্রন্থে স্থিতিশীল দলের বিচারের মানদণ্ডের দ্বারা তাঁহার সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলির বিচার

করিয়াছেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন ইহা স্বীকার্য্য, কিন্তু ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী গতিশীল পক্ষকে বরাবরই তিনি প্রতিপক্ষেরই ন্যায় গণ্য করিয়াছেন। তাঁহার বিচারের সহিত আমাদের বিচারের পার্থক্য কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইলাম বটে, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি তাঁহার তরফের কথা যে জোরের সহিত এবং যথেষ্ট নৈপুণ্যের সহিত বলিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আর কোন প্রশ্ন নাই। আমাদের দেশে সচরাচর যে-সকল লোক স্থিতিশীলতার পক্ষ লইয়া সামাজিক প্রশ্নের আলোচনা করিয়া থাকে, তাহাদের অনেকের নাম পাঠকেরা অবগত আছেন এবং তাহাদের প্রলাপবাণী যে অনেক সময়ে কিরূপ হাস্যকর এবং সময়ে সময়ে কিরূপ বিরক্তিকর হয় তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। সেই-সকল লেখকের নামের সহিত রামেন্দ্র বাবুর নামোচ্চারণ করাও বিগর্হিত। তিনি যে মতই প্রচার করুন্— সাহিত্যের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, তাঁহার ন্যায় মনস্বী প্রবন্ধলেখক আমাদের দেশে দুএকজন ব্যতীত আর কেহই নাই। মতামতের উপর সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষের নির্ভর নাই। যিনি যে-মতই প্রচার করুন, যাহাই বলুন, যদি তাঁহার রচনায় আগাগোড়া একটি যুক্তির সুসঙ্গতি থাকে, ভাবপ্রকাশের সংযত ও নিপুণ সৌন্দর্য্য থাকে, ভাষা ভাবকে কোথাও আচ্ছন্ন না করিয়া তাহাকে সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারে এবং গতি দান করিতে পারে, তবেই রচনা সাহিত্য হিসাবে উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে। রামেন্দ্র বাবুর এই গ্রন্থখানি আমাদের সাহিত্যের সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাধনা

ধর্ম্মজগতে আমরা সচরাচর দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাই। এক শ্রেণীর লোক নীতিপরায়ণ, অন্য শ্রেণীর লোক ভক্তিপরায়ণ। এক শ্রেণীর লোক কেবলি কাজ করিতেছে এবং কর্ত্তব্যজালকে বিস্তীর্ণ করিয়া আর শেষ করিতে পারিতেছে না, তাহাদের কাজের আকাঙ্ক্ষা যেন আর মিটিতে চায় না। অন্য শ্রেণীর লোক কাজ করিয়াও কাজে বাঁধা পড়িতেছে না, চাওয়া এবং পাওয়াকে এক করিয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া রহিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে অবিরত চেষ্টা, অন্য শ্রেণীর লোকের মধ্যে "অকূল শান্তি, বিপুল বিরতি।"

দৃষ্টান্তস্বরূপে একজন ইংরেজ পাদ্রী ও আমাদের দেশীয় একজন যথার্থ ভক্ত, এই দুই জনের চিত্র পাশাপাশি কল্পনা করিতে অনুরোধ করি। পাদ্রী অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া থাকেন সন্দেহ নাই,—যাহারা দরিদ্র তাহাদের শিক্ষার জন্য অন্নবস্ত্রের জন্য সর্ব্বদাই তিনি খাটিতেছেন, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, দুর্নীতি দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। দিন রাত্রি শ্রমের মধ্যে তিনি এমনি জড়াইয়া আছেন যে ভগবানের ধ্যানধারণারও সময় তাঁহার অল্পই থাকে। দুদণ্ড স্থির হইয়া বসিবার অবকাশ তাঁহার থাকে না।

আমাদের দেশীয় ভক্তের সে সকল বালাই কিছুই নাই। তিনি অল্পই কাজ করেন, কিন্তু কাজ করিতে করিতে রামপ্রসাদ সেনের মত হয়ত আত্মবিস্মৃত হইয়া জমাখরচের হিসাব-খাতায় ভক্তির উচ্ছ্বাসকে লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলেন। কাজ তাঁহাকে কোথাও পাইয়া বসে না, তিনি ভগবানের মাধুর্য্যরসে সর্ব্বদাই নিমগ্ন হইয়া

আছেন। সকল দৃশ্যে গন্ধে স্বাদে তাঁহারি স্পর্শ পাইয়া পুলকিত হইতেছেন, সকল মানবসম্বন্ধের মধ্যে তাঁহার নিখিলরসামৃত-মূর্ত্তি জাগিতেছে। তাঁহার পরিতৃপ্ত হৃদয় যেন বলিতেছে,—এই যে তিনি আমার অন্নপানে মা হইয়া আমায় খাওয়াইতেছেন, এই যে তিনি সকল দৃশ্য গন্ধ শব্দ রন্ধ্রে করিয়া বাঁশী বাজাইয়া আমার মন হরণ করিতেছেন, এই যে সকল কর্ম্মে সকল দুঃখে আঘাতে অপমানে আমার সঙ্গে তাঁহার প্রেমের বিরহমিলন-লীলা চলিতেছে। আমার জীবনকে ভিতর হইতে একেবারে অধিকার করিয়া সেই পিতামাতা, সেই স্বামী, সেই বন্ধু প্রকাশ পাইতেছেন। এই প্রাপ্তির আনন্দে সেই ভক্তের সকল চাওয়ার অন্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহার আর অভাববোধ নাই।

মোটামুটি এই যে দুই শ্রেণীর সাধকের দুইটি চিত্রের কথা বলা গেল, তাহা আমাদের দেশের ও পশ্চিম মহাদেশের ধর্ম্মসাধনার দুইটি আদর্শ। পশ্চিম মহাদেশের ধর্ম্মসাধনাকে মুখ্যতঃ নীতিপ্রধান বলা যাইতে পারে ও আমাদের ধর্ম্মসাধনাকে মুখ্যতঃ ভক্তিপ্রধান বলা যাইতে পারে।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আধুনিককালে এই দুই দিকের ধর্ম্মসাধনার সামঞ্জস্যের জন্য এদেশে এবং পাশ্চাত্য দেশে উভয় দেশেই একটা চেষ্টার উপক্রম লক্ষিত হইতেছে। যে ইউরোপ ধর্ম্মনীতিকে আশ্রয় করিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে থাকাকেই চরম লাভ বলিয়া মনে করিয়াছিল, মানুষের শক্তির যে কোনখানে সীমা আছে তাহা স্বীকার করিতেই চাহে নাই, সে এখন চলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাইতেছে। সে বলিতেছে—"নীতিপ্রধান জীবনের বিরুদ্ধে এই ভিতরে ভিতরে বিদ্রোহের অর্থই এই যে, আমাদের চেতনার মধ্যে এমন গভীরতর উপাদান আছে যাহা কেবলি অগ্রসর

হওয়ার দ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না ; যাহা স্থিতি চাহে, প্রাপ্তি চাহে —জীবনের ব্যবহারই যাহার কামনার বিষয় নহে, কিন্তু জীবনের আনন্দ।"

এই কথাটি একজন বিশিষ্ট লেখকের রচনা হইতে অনুবাদ করিলাম, কিন্তু এ কথা আধুনিক কালের সকল মনীষিগণই বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ধর্ম্মনৈতিক জীবন যে আধ্যাত্মিক জীবনের সম্পূর্ণতা ও আনন্দে পৌঁছাইতে পারেনা এমন আভাস নানা লোকের মুখে পাওয়া যাইতেছে।

আবার এদিকে আমাদের দেশে অধুনা যে আন্দোলন সকল জাগিয়াছে তাহা আমাদিগকে উল্টা দিকে আঘাত করিতেছে। তাহা বলিতেছে যে আমাদের মধ্যে ভক্তি আছে, মাধুর্য্য আছে ; কিন্তু মানবসেবা, মঙ্গল কর্ম্মের প্রতি স্থিরনিষ্ঠ অনুরাগ আমাদের মধ্যে নাই। অর্থাৎ ধর্ম্মনীতিকে খুব জোর করিয়া ধরিয়া কর্ম্মকে নানা লোকের মধ্যে সফল করিয়া তুলিবার শক্তি আমাদের মধ্যে কোথাও দেখা যাইতেছে না। সকলের সহিত মিলিবার ও মিলাইবার শক্তির অভাবে আমাদের সমাজে ব্যবস্থা ও নিয়ম কর্ম্মকে কঠিন করিয়া গড়িতেছে না। এমন কোন অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানই নাই যাহার মধ্যে সকলের সম্মিলিত চেষ্টার একটি বড় রূপ প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং আমাদের আধ্যাত্মিক পরিতৃপ্তি ভাবরসসম্ভোগ মাত্র ; তাহা কর্ম্মে সফল হয় নাই, তাহা ধর্ম্মনীতিকে আপন অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া বেশ কঠিন ও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। আমাদের দেশের অনেক লোকের মুখ হইতেই এ সকল কথা আমরা আজকাল শুনিতেছি।

এ কথা বলিতেই হইবে যে নিত্য সত্যকে খণ্ডকালের মধ্যে পূর্ণ করিয়া দেখা কঠিন। এখনকার কালে হয়ত এ দেশে ধর্ম্মনীতিকে

এবং অন্য দেশে আধ্যাত্মিক শান্তি ও আনন্দকে প্রাধান্য দিতেছে। সুতরাং এ সকল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ধাক্কার মধ্যে পরিপূর্ণ সত্যের অখণ্ড মূর্ত্তিটি কি তাহা চোখে নাও পড়িতে পারে। কেহ একদিক, কেহ অন্য দিক্‌কেই বড় করিয়া তুলিবেন।

কিন্তু আমাদের পুরাণে যেমন বলে যে প্রলয়ের মধ্যেই নাকি সৃষ্টি নিহিত থাকে; সেইরূপ এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার ঠেলাঠেলির ভিতর হইতেই আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, পূর্ব্ব পশ্চিমের এবং পশ্চিম পূর্ব্বের অঙ্গ পূরণ করিতেছে। পশ্চিম অত্যন্ত বেশি চলিয়াছে তাই সে থামিতে চায় এবং পূর্ব্বদেশ অত্যন্ত বেশি থামিয়া আছে তাই সে চলিতে চায়, কেবল ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার স্বাভাবিক নিয়ম হইতেই যে এরূপ ঘটিতেছে তাহা নহে—পূর্ব্ব-পশ্চিমে মিলিয়া বিশ্বমানব নামক একটি অখণ্ড নূতন বস্তুর জন্মলাভ হইতেছে।

কলম্বস্‌ যখন তাঁহার নাবিকদলকে লইয়া নব আমেরিকা আবিষ্কার করিতে বাহির হইয়া পড়েন, তখন তাঁহার সঙ্গিগণের এই ভয় হইয়াছিল যে পৃথিবীর একেবারে প্রান্তসীমায় গেলে পাতালের অতল গর্ত্তে তাহারা পড়িয়া যাইবে, কারণ পৃথিবীর গোলত্ব সম্বন্ধে তখনও তাহাদের সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না।

ইউরোপ বরাবরই পৃথিবীর ন্যায় সত্যকেও গোল করিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ করিয়া না দেখিয়া চ্যাপ্টা করিয়াই দেখিয়া আসিয়াছে। মধ্যযুগে সে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্ত্যের বিচ্ছেদ কল্পনা করিয়া ইন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া মন্ত্রতন্ত্র দ্বারা কোন মতে স্বর্গে উড়িবার পাখা গজাইবার চেষ্টায় ছিল। কিছুদূর উড়িতেই যখন সে ধূলায় আছাড় খাইয়া পড়িল, তখন পৃথিবীটাই সত্য হইয়া স্বর্গলোক একেবারেই মিথ্যা হইয়া গেল। তখন হইতে কেবলি পাইব, কেবলি চলিব, কেবলি বাড়িব, এই কথাই তাহার শয়ন স্বপনের সাথী হইয়া রহিল।

আমরা জানি যে সাহিত্যই প্রত্যেক দেশের বা জাতির ভিতরের যথার্থ ও নিত্য প্রতিকৃতিকে অঙ্কিত করে। দেশের বা জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা ও বেদনা সমস্তই সাহিত্যের ভিতর অত্যন্ত বৃহৎ ও বিশ্বব্যাপক হইয়া দেখা দেয়।

ধর্ম্মনীতিকে অর্থাৎ কেবলি উন্নতিলাভের সাধনার আদর্শকেই ইউরোপ চরম আদর্শ মনে করিয়াছে এবং পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দের সাধনাকে সে গ্রহণ করে নাই,—একথা যদি সত্য হয়, তবে দেখা যাক্ ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের মধ্যে এ কথার সাক্ষ্য পাওয়া যায় কিনা।

আমার তো মনে হয়, যে ইউরোপীয় আধুনিক সাহিত্যের ভিতরেও আমরা এই কথাই অনুভব করি। সেখানে আমরা প্রাপ্তির আনন্দের কথা তেমন করিয়া পাইনা, যেমন ক্রমাগত সংগ্রামের দ্বারা কেবলি গতির মুখে ও বৈচিত্র্যের মধ্যে জীবনকে নীত করিবার কথা পাই। জীবনের মধ্যে পথটাই আসল, গন্তব্যস্থান থাক্ বা নাই থাক্ তাহার খোঁজ লইবার কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ জীবন মানেই বৈচিত্র্য এবং সেই সকল বৈচিত্র্যেরই স্বাদ আমাদিগকে পাইতে হইবে—এই কথাটাই আধুনিক পাশ্চাত্য কবিগণ একটু বেশি জোরের সঙ্গেই বলিয়া থাকেন।

আমার আশঙ্কা হয় যে আমাদের ন্যায় বিধিনিষেধপ্রবল গতানুগতিক দেশে জীবনকে কেবল জীবনী বলিয়াই বড় করিয়া ধরিবার ও পূজা করিবার তাৎপর্য্য আমরা ঠিক্‌মত না বুঝিতেও পারি। তাহার কারণ ইউরোপে ব্যক্তিত্বমাত্রকে যে কত বড় করিয়া দেখে তাহা আমরা জানিনা। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর বস্তু পৃথিবীতে আর কি কিছুই আছে? ইহাকে সংস্কার-

পাশমুক্ত, স্বাধীন, স্ফূর্ত্ত ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য সে দেশের ধর্ম্মে, রাষ্ট্রে ও সমাজে, বিপ্লবের পর বিপ্লব কেবলি তরঙ্গিত হইতেছে। প্রত্যেক ব্যক্তি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া আপনাকে আপনি আশ্চর্য্যরূপে উপলব্ধি করিবে, ইহাই সে দেশের মর্ম্মের অভিলাষ, সে দেশের প্রাণের কথা। সেই কারণেই জীবন কেবলি চলিতে থাকিবে, ইহাতে সে দেশের লোক এত আনন্দ বোধ করে—সেই চলাতেই তো জীবনের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

জর্ম্মান মহাকবি গ্যয়টেরচিত "ফাউষ্ট" নাটকের প্রথম দৃশ্যে, যেখানে ফাউষ্ট আপনার অবরুদ্ধ জ্ঞানের গণ্ডী ছাড়াইয়া বাস্তব জগতের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে আধুনিক জীবনের এই গতিতত্ত্বের সমস্ত ভাবটি গ্যয়টের এই একটি শ্লোকে চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে;—

"জীবনের বানে কর্ম্মতুফানে
চলি, ফিরি, দুলি, ঘুরি—
রহি আমি সব জুড়ি!
জনম-মরণ-রঙ্গ
মহাসাগরতরঙ্গ।
জাল সদা চলে বেড়ে
গেঁথে চলে জীবনেরে
প্রাণময় যে বসন মহেশ্বর পরেন আনন্দে
বুনি তাহা মহাকাল-বয়নের ধ্বনিময় তন্ত্রে!"

কবি গ্যয়টের বিশ্বাস ছিল যে আমাদের জীবনের ভাল মন্দ প্রত্যেক অভিজ্ঞতারই মূল্য আছে। তিনি মনে করিতেন যে, জীবনের সকল বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে ঐ ক্রমাগত চলাটাই একটা

ঐক্যকে জালের মত গাঁথিয়া তোলে। না চলিলে জীবন এক-জায়গায় বাঁধা পড়িয়া মিথ্যা হইয়া যায়।

"ফাউষ্ট" নাট্যে ফাউষ্ট এই বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতার রাজ্যকে ত্যাগ করিয়া কেবল পুঁথিগত কল্পনার দ্বারা সমস্ত সত্যকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় ছিল; এই উপায়ে তাহার মানবপ্রকৃতি আপনার খোরাক পায় নাই। সেই জন্য খুব একটা প্রচণ্ড পাপের মধ্যে, পঙ্কের মধ্যে তাহাকে ডুবাইয়া গ্যয়টে তাহার মুক্তির সূচনা করিয়া দিলেন। ঐ নাট্যে তিনি এই কথাটিই বলিলেন যে, চলিতেই হইবে, স্থিতিশীলতার মধ্যে মুক্তি নাই।

গ্যয়টে তাঁহার অন্যান্য রচনাতেও বহুস্থানে বলিয়াছেন যে বর্ত্তমান হইতে বাস্তব হইতে সুদূরস্থিত একটা অনন্তত্বের বোধ তাঁহার কাছে একেবারে কাল্পনিক ও শূন্য বলিয়া বোধ হয়। বস্তুত এই কারণেই তিনি খৃষ্টধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মে স্বর্গকে মর্ত্ত্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে—সে একটাকে বলে চিরন্তন, অন্যটাকে বলে ক্ষণিক। কিন্তু ক্ষণিকের মধ্যে যে চিরন্তন নাই সে চিরন্তনকে মানুষ চায় না, সে চিরন্তন সত্যই নয়। ইতালী হইতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়া গ্যয়টে ইতালীর চিত্রশালাসমূহে মধ্যযুগের ভুক্তিভাবপূর্ণ খৃষ্টীয় পুরাণের চিত্রসকল দেখিয়া সে গুলিকে "বীভৎস" চিত্র বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন। তাহার কারণ তাঁহার দৃষ্টিটা ছিল আসলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি—জীবনকে তিনি দেখিতেন একটা চলনধর্ম্মী পরিবর্ত্তনশীল জিনিসের মত। জীবনের নিত্যগতিই তাহার নিত্য আনন্দ জাগাইতেছে।

গ্যয়টেকে যেমন দেখা গেল তেমনি ব্রাউনিংয়ের মধ্যেও এই গতিতত্ত্বের পরিচয় লাভ করা যায়। আমার তাই বিশ্বাস যে এটা ইউরোপের মজ্জাগত কথা। সেখানে চলাটাতেই লোকে

আনন্দ অনুভব করে এবং নিশ্চেষ্টতাকে জড়ত্ব ও মৃত্যু মনে করে। কেবলি সংগ্রাম করিয়া অগ্রসর হইব, কেবলি পাইতে থাকিব—ইহাই সেখানকার অন্তরতর বিশ্বাসের কথা।

ব্রাউনিং খৃষ্টধর্ম্মে খুবই আস্থাবান ছিলেন। খৃষ্টধর্ম্মের মূলতত্ত্বটি এই যে, ভগবান মানুষের মধ্যে তাহার আপন হইয়া নামিয়া আসেন এবং মানুষ তাহার প্রেমের আত্মবিসর্জ্জনের দ্বারা ভগবানের দিকে উন্নীত হয়। এই মূল সূত্রটির দ্বারাই ব্রাউনিং সমস্ত মানবজীবনের সুখ দুঃখ পাপপুণ্যের বিচিত্রতাকে গাঁথিয়া এক করিয়া দেখিতে পারিয়াছিলেন। সেইজন্য ঘোরতর পাপের চিত্র হইতেও তিনি নিরস্ত হন নাই।

> "ঈশ্বর জানেন মোরা কতই পতিত!
> তবু এত হীন নহি, যে জীবনে কভু
> আসিবে না অকস্মাৎ মুহূর্ত্ত এমন
> যখন এ অন্তরের সুচির সম্পদ্
> হেরিব উজ্জ্বল করি; মিথ্যা আবরণ
> বিদীর্ণ করিয়া। জানিতে পারিব স্থির
> চলিয়াছি সত্য পথে কিম্বা ভুল পথে
> বিজয়গৌরবে কিম্বা শূন্য ব্যর্থতায়।"—ব্রাউনিংয়ের "ক্রিষ্টিনা।"

তথাপি প্রেমের এমন দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও কোথাও যে একেবারে চরম প্রাপ্তি আছে এ বিশ্বাস ব্রাউনিংয়েরও নাই। তাঁহার প্রেমের তত্ত্বটি কোন জায়গায় গিয়া বলে নাই, বেদাহমেতং—আমি জানিয়াছি, আমি পাইয়াছি। সে বড় জোর উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের মত বলিয়াছে যে কোন কোন মুহূর্ত্তে আভাস মাত্র পাইয়াছি। যখন প্রেম জাগিয়াছে, তখন পাপের নিবিড় অন্ধকারের রন্ধ্র ভেদ করিয়া অনন্তের আলো আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তখন

বুঝিয়াছি এই যে, এমনি করিয়া জীবনের তরঙ্গে অভিহত হইতে হইতে ক্রমাগত এক এক মুহূর্ত্তে পাইতে থাকিব, যে 'moment made eternity'—যে মুহূর্ত্ত অনন্ত হইয়া উঠিবে।

নুম্‌ফোলেপ্টস্ ('Numpholeptos') নামক ব্রাউনিংয়ের এক প্রেমের কবিতায় ইহার সাক্ষ্য পাই। কবিতাটি এইঃ—একজন মানুষ এক অপ্সরার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছিল। প্রণয়ী তাহার একটি দাবী মিটাইতে সমর্থ হইলে সেই অপ্সরী তাহার প্রণয়প্রার্থনা পূর্ণ করিতে রাজি ছিল। দাবীটি এই যে, মানব-প্রণয়ীটিকে জীবনের সকল অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়াই যাইতে হইবে অথচ অম্লান থাকিতে হইবে, কোন কালিমা তাহাকে কোথাও স্পর্শ করিবে না। এই কল্পিত নারীটি পার্থিব জীবনের সকল পথের মোড়ের মাথায় একেবারে অচঞ্চল শান্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। পথগুলি আবেগের নানা বর্ণে রঞ্জিত হইয়া বিচ্ছুরিত হইতেছে, কিন্তু সেই রমণী ধ্রুব শুভ্র নিরঞ্জন আলোকরশ্মির মত স্থির দণ্ডায়মান।

"এ কোন্ মায়ার পথে আমি চলিয়াছি !

* * *

সকল পথের ঐ মর্ম্মমাঝে তুমি
তোমার অন্তরতম পূর্ণতা হইতে
বাহিরিছে রশ্মিরাজি নানাবর্ণময় !"

এই নানা বর্ণরঞ্জিত পথের ভিতর দিয়া তাহার প্রণয়ীকে শুভ্র হইয়া তাহার কাছে আসিতে হইবে, এই তাহার দাবী। কিন্তু হায়, সে দাবী মিটাইবার সাধ্য তাহার নাই; অভিজ্ঞতার নানা রং লাগিবেই, সুতরাং প্রণয়ও কোন দিন সম্পূর্ণ হইবে না।

এক একটি পথের ভিতর দিয়া যখনই সে রঞ্জিত হইয়া উপস্থিত হইতেছে, তখন

"তুমি যেন চিনিতে না পার! অবিশ্বাস!
অবাক হেরিয়া মোর এ বীভৎস রূপ!"

সুতরাং কেবলি নূতন নূতন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া ক্রমাগতই চলিতে হইবে, স্নুন্‌ফোলেপ্টস্ কবিতাটির ইহাই মর্ম্মকথা।

ব্রাউনিংয়ের ন্যায় কবি ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যান্ সমস্ত মানুষের সুখদুঃখ উত্থান পতনকে খুব একটি পূর্ণতার ভাবের মধ্যে বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। যে কোন অবস্থায়, দারুণ অধঃপতনের যে কোন নিম্নতম সোপানে মানুষ থাকুক্ না কেন, তাহার সকল আবরণ ভেদ করিয়া তাহার অন্তরতম নির্ম্মল ঈশ্বর মূর্ত্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া এই কবি মানুষকে ডাক দিয়া গাহিয়াছেন ঃ—

"হও না যে কেহ তুমি, আমি জানি স্বপ্ন-পথে ভ্রমিতেছ তুমি!
এই সব কাল্পনিক মিথ্যা যাহা ঘিরি আছে—খসিয়া পাড়বে তাহা
নিশ্চয়ই জানি!
এখনি এ মুহূর্ত্তেই তব মুখ, হাসি, বাক্য, গৃহ, ব্যবসায়, ব্যবহার, দুঃখকষ্ট,
অজ্ঞান ও পাপ কোন্‌খানে যেতেছে মিলায়ে
যে আত্মা তোমার সত্য— সত্য যে শরীর—পূর্ণ তাহা সম্মুখে আমার!" *

কিন্তু তাঁহারও সমস্ত কবিতার বক্তব্য ঐ যে, কেবলি চলার দ্বারাই আমাদের জীবনের পরিধি বিস্তৃততর হয়। আমাদের কোথাও বিশ্রামের উপায় নাই—কেবলি চলিতে হইবে ঃ—

* "To you" নামক কবিতা হইতে।

"চলে এস ! থামিতে নারিব মোরা হেথা !
দীর্ঘকালসঞ্চিত এ মাধুর্য্য-ভাণ্ডার যত প্রিয় হোক্
হোক্ যত আরামের এই ঘরবাড়ি—
চলে এস ! থামিতে নারিব মোরা হেথা ।" ‡

চলিতেই হইবে, কারণ সকলেই চলিয়াছে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কেহই কোথাও বসিয়া নাই, সুখদুঃখ আলোঅন্ধকারের ভিতর দিয়া দিন রাত্রি মাস বৎসর যুগযুগান্ত মানবযাত্রী চলিয়াছে—

"চলেছে চলেছে তা'রা ! আমি জানি তা'রা চলিয়াছে ! শুধু জানিনা কোথায় !
কিন্তু জানি চলিয়াছে সুমহৎ সুদূর কল্যাণ পানে !" ‡

তবেই দেখা গেল যে আমরা ইউরোপীয় সাহিত্যে এই চলিবার দিক্‌টা যেমন করিয়া দেখি, থামিবার দিক্‌টা পাইবার কথাটা তেমন করিয়া দেখিতে পাই না। আমি তাহার কারণ বলিয়াছি যে ধর্ম্মনীতির বোধের মত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ইউরোপে এখনো তেমন জাগ্রত হয় নাই। কেবল সম্প্রতি ধর্ম্মনীতির দ্বন্দ্বযুদ্ধ ছাড়াইয়া অধ্যাত্ম-শান্তির বিরতির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য ইউরোপীয় চিত্তে একটা ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছে।

কেয়ার্ড তাঁহার Introduction to the Philosophy of religion-এ এক স্থানে বলিয়াছেন যে, "আধ্যাত্মিকতা ধর্ম্মনীতির চেয়ে এইজন্য শ্রেষ্ঠ যে ধর্ম্মনীতির আদর্শ ক্রমোন্নতির ভিতর দিয়া উপলব্ধ হয় কিন্তু অধ্যাত্মসাধনার লক্ষ্য একেবারেই 'এই যে এইখানে' এমন প্রত্যক্ষবৎ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধ হইয়া থাকে।"

ইউরোপীয়গণ নিজেরা এ কথা কোন কোন জায়গায় স্বীকার করিলেও ভিতরে ভিতরে এই কথাটির প্রতি তেমন আস্থাবান্ নহেন।

‡ "Song of the open road" নামক কবিতা হইতে।

তাহার প্রমাণ পাই যখন ভারতবর্ষীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা আলোচনা করেন। তাঁহারা ভাবেন যে ভারতবর্ষ যে বলিয়াছে যে, সর্ব্বোচ্চ সত্যকে একেবারে করতলন্যস্ত আমলকবৎ ধরা যায়; তাহাকে "এষঃ" এই—বলিয়া চোখে দেখা যায়, আস্বাদন করা যায়; তাহার মধ্যে আনন্দে ভরপুর হইয়া অষ্টপ্রহর বাস করা যায়; স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধা, তরতি শোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতোভবতি—সমস্ত শোক, সমস্ত পাপকে দূরে ফেলিয়া আনন্দে একেবারে ওতপ্রোত হইয়া অচঞ্চল হইয়া থাকা যায়;—এ সকল কথা অলীক এবং এ রকম শান্তরসাস্পদ সাধনা মানুষকে তামসিকতার দিকেই লইয়া যায়। তাঁহারা ইহাকে Quietism অর্থাৎ উদাসীনতার সাধনা নাম দিয়া ব্যঙ্গ করিয়াও থাকেন। ভারতবর্ষের অনেক পণ্ডিতমূর্খও সেই ব্যঙ্গে যোগ দান করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দেন।

কিন্তু ভারতবর্ষ যদি কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার দিকে ষোল আনা ঝোঁক দিয়া নৈতিক সাধনাকে একেবারে অবজ্ঞা করিত—যদি দেখিতাম, ভাবরসসম্ভোগ করাই পর্য্যাপ্ত এই কথা সে বলিয়াছে, গুহাগ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইবার জন্য কর্ম্ম করিতে হইবে এ কথা বলে নাই,—এ কথা বলে নাই যে

ন কর্ম্মাণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে

কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া কেহ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না

নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি

কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া যায় না—তবে এ সকল অপবাদ সহ্য করিতে রাজি ছিলাম। ভারতবর্ষ ধর্ম্মনৈতিক সাধনাকেও স্বীকার করে কিন্তু তাহাকে পথ বলিয়া জানে মাত্র, আধ্যাত্মিক সাধনার দ্বারা পরমানন্দ-লাভই তাহার গন্তব্যস্থান।

সেই জন্য যাহা আর কোথাও এমন জোরের সঙ্গে বলা হয় নাই তাহাই ভারতবর্ষ বলিয়াছে যে পরিবর্ত্তনের নিয়ম, অভিব্যক্তির নিয়ম সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কাজ করিলেও একটি জায়গা আছে যেখানে পরিপূর্ণ সমাপ্তি—সে আত্মায়। সেই খানেই কেয়ার্ড যাহাকে here and now realisation বলিয়াছেন তাহাই আছে। সেখানে সকল চলা থামিয়াছে, সকল খণ্ডতা মিলিয়াছে, সকল বৈচিত্র্য ঐক্য লাভ করিয়াছে।

ইউরোপীয় কাব্যে যেরূপ দেখা গেল, তেমনি যদি আমরা ভারত-বর্ষীয় কোন তত্ত্বদর্শী কবির কাব্য আলোচনা করি, তবে কি ইউরোপীয় কাব্যের মত সেখানেও দেখিতে পাইব যে, জীবনের অভিজ্ঞতাগুলি কেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত একটা আরেকটাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, কেমন সবটাকে মিলাইয়া একটা চলনশীল ব্যাপ্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে? না। এমন করিয়া আপনাকে আপনার গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখিয়া জীবনকে কেবলি নানাখানার মধ্যে আমাদের কবিরা ছাড়িয়া দেন্ নাই।

ইউরোপীয় কাব্য খুবই বাস্তবাশ্রিত সন্দেহ নাই, কিন্তু তথাপি তাহার অমৃতধারা যে মানুষের হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করিতেছে না তাহা আধুনিক একজন ইংরেজ লেখকের একটি উক্তি হইতেই প্রতীয়মান হইবে:—"সমস্ত জীবনের সত্যটা কি একটা অন্তবিহীন ইস্কুলের মত, যাহার খেলিবার প্রাঙ্গণের দেয়ালগুলি পর্য্যন্ত বিধিনিষেধের ছাপমারা, যাহার উপরের জানালা হইতে মাষ্টারেরাও পাহারা দিতেছে? আমাদের কি এই কথা বলিয়াই নিজেদের ভুলাইতে হইবে যে চেষ্টাই পুরস্কার?"

ভারতবর্ষের বড় ধর্ম্মসাহিত্যে এবং কাব্যে প্রাপ্তির আনন্দের কথাই বলিয়াছে, পথের কথা তেমন করিয়া বলে নাই। সে সকল

কবিতা objective কিনা অর্থাৎ, বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ হইতে পারে। তবু এ কথা বলিতে হইবে যে, তাহাদের মধ্যে বিচিত্রতার ছবি নাই বটে কিন্তু বিচিত্রতার স্বাদ আছে। তাহারা বিনা মূলের গাছের মত, "সাখা পত্র নহী কছু তাকে, সকল কমল দল গাজৈ"—শাখাপত্র কিছুই তাহাদের নাই, সর্ব্বত্রই কমলদল বিকশিত। পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আনন্দের সেই কমলদলই ভারতের ধর্ম্মকাব্যের মধ্যে একমাত্র দেখিবার বিষয়।

উপনিষদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের কবীর, নানক, দাদূ প্রভৃতির রচনায়, বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাহিত্যে এবং আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং ধর্ম্মনৈতিক এই দুই সাধনার বার্ত্তাই পরিপূর্ণভাবে মিলিয়া আছে।

প্রথমেই উপনিষদের কথা ধরা যাক্।

অধ্যাপক পৌল্ ডয়সন্ তাঁহার "উপনিষদের তত্ত্ব" নামক গ্রন্থে এক জায়গায় বলিয়াছেন যে বুদ্ধির মুক্তির দিকে আমাদের ঋষিরা যত দৃষ্টি দিয়াছিলেন, এমন বাসনার মুক্তির দিকে দেন্ নাই।

কিন্তু তাহার কারণ এই যে, উপনিষদ্ যে কাব্য; তাহাতো অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থের ন্যায় কিসে মানুষের মুক্তি হইবে, গোড়া হইতেই সেই চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহা একেবারে দেখিয়াছে যে, আনন্দ হইতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জন্ম লাভ করিয়াছে এবং সেই আনন্দে, সেই প্রাণে সমস্তই অহরহ কম্পিত হইতেছে। বিশ্বের সেই আনন্দময় প্রকাশকে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মার ভিতরেই উপলব্ধি করা যায়, এই কথা উপনিষদ্ বলিয়াছে। জ্ঞানের মুক্তিই মুক্তি, না বাসনার মুক্তিই মুক্তি, এ সকল প্রশ্নই তাহার মধ্যে নাই। তথাপি ডয়সন্ যাহা বলিয়াছেন তাহা সত্যও নয়। কারণ উপনিষদে নানাস্থানে এই ধরণের উক্তিও দেখিতে পাই;—

নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো না সমাহিতঃ
না শান্তমানসোবাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই এবং কর্ম্ম-ফলকামনাপ্রযুক্ত যাহার মন শান্ত হয় নাই, সে ব্যক্তি কেবল জ্ঞানের দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় না।

ধর্ম্মনৈতিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি না থাকিলে এ সকল কথা কখনই তাহার ভিতরে স্থান পাইত না। ক্ষেত্র চাষ করিতেই হইবে, আগাছা উপড়াইয়া মাটী হলদ্বারা দীর্ণ করিয়া ঢেলা ভাঙ্গিয়া জমি প্রস্তুত করিতে হইবে;—কিন্তু কেবলি হল চালনা করিব, কোথাও থামিব না, একথা এ দেশীয় সাধকেরা বলেন না। তাঁহারা বলেন যে, এক জায়গায় থামিতেই হইবে। যখন আষাঢ়ের মেদুর শ্যামল মেঘে দশদিক্ আচ্ছন্ন হইবে, তখন ধারাবর্ষণে সমস্ত উপ্তবীজ দেখিতে দেখিতে শ্যামল শস্যের অপূর্ব্ব প্রকাশকে বিকীর্ণ করিয়া দিবে, তখন চেষ্টার আর কোন প্রয়োজন থাকিবে না। শেষ আছেই, কেবলি চেষ্টা নয়—এই কথাই আমাদের শাস্ত্রসাহিত্যের ভিতরের কথা।

কবীরও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন ঃ—

"জবলগ মেরী মেরী করে
তবলগ কাজ একো না সরে ॥
জব মেরী মমতা মর্ যায়
তব লগ প্রভু কাজ সবারৈ আয় ॥
জ্ঞানকে কারণ করম কমায়
হোয় জ্ঞান তব করম না সায় ॥
ফল কারণ ফুলৈ বনরায়
ফল লাগে পর ফূল সুখায় ॥"

"যতক্ষণ লোক আমার আমার করে—ততক্ষণ একটি কার্য্যও নিষ্পন্ন

হয় না। যখন আমার আমিত্ব মরিয়া যায় তখনি প্রভুর কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। জ্ঞান উৎপন্ন হইবার জন্যই কর্ম্ম করা, জ্ঞান হইলে কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলের জন্য পুষ্প উদ্‌গত হয়, ফল হইলে পুষ্প আপনিই ঝরিয়া পড়ে।" *

উপরে কবীরের যে শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতে মনে হইতে পারে যে তিনি বুঝি কেবল কর্ম্ম কতদূর পর্য্যন্ত এবং প্রাপ্তিরই বা কোথায় আরম্ভ তাহা নির্দ্দেশ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু তাহা নহে। সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে আত্মার পরমানন্দময় যোগ ও একাত্মকতার ভাবটি তাঁহার কবিত্বকে উৎসারিত করিয়াছে। সেই প্রাপ্তির আনন্দে তিনিও ভরপুর। তিনি বলিতেছেন্ ঃ—

"ইস ঘট অন্তর বাগ বগীচে
ইসী মেঁ সিরজনহারা।
ইস ঘট অন্তর সাত সমুন্দর
ইসী মেঁ নৌলখতারা।
ইস ঘট অন্তর পারসমোতী
ইসী মেঁ পরখনহারা—
ইস ঘট অন্তর অনহদ গরজৈ
ইসী মেঁ ফুটত ফুহারা।
কহত কবীর সুনো ভাই সাধো
ইসী মেঁ সাঁঈ হমারা।"

"এই ঘটের মধ্যেই কুঞ্জ নিকুঞ্জ, ইহারি মধ্যে তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা। এই ঘটের মধ্যে সপ্ত সমুদ্র, ইহার মধ্যে নবলক্ষ তারা, এই ঘটের মধ্যেই পরশমণি, ইহারি মধ্যে রত্ন-পরীক্ষক। এই ঘটের মধ্যে অসীম নিনাদিত, ইহারি মধ্যে উৎস উঠিতেছে, কবীর কহেন, শুন ভাই সাধু, ইহারি মধ্যে আমার স্বামী।" *

অথচ আশ্চর্য্য এই যে কেবলি আত্মগত ভাবের মধ্যে বাঁধা থাকিবার কোন লক্ষণ কবীরের মধ্যে দেখা যায় না। তিনি যেমন তাঁহার আত্মগত উপলব্ধিকে স্বীকার করেন, তেমনিই বিশ্বের বস্তুগত বাহ্য সত্তাকেও স্বীকার করেন। এক রকম করিয়া প্রত্যক্ষ জগৎকে বাদ দিয়া জগতের দার্শনিক ভাবটিকে খুব বড় করিয়া দেখান যাইতে পারে। কিন্তু কবীর যে কবি, তিনি রূপ-রস-গন্ধ-শব্দময় জগৎকে মায়াছায়া বলিয়া উড়াইতে কি পারেন? তিনি সীমাকে এবং অসীমকে, ভাবকে এবং রূপকে, বিচিত্রকে এবং এককে গায়ে গায়ে মিলাইয়া দেখিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত শ্লোকটিই তাহার প্রমাণ;—

"ঐসালো নহিঁ তৈসালো
মৈঁ কেহি বিধি কথৌ গম্ভীরালো।
ভীতর কহূঁ তো জগময় লাজৈ
বাহর কহূঁ তো ঝূটা লো।
বাহর ভীতর সকল নিরন্তর
চিত অচিত দউ পীঠালো।
দৃষ্টি ন মুষ্টি পরগট অগোচর
বাতন কহা ন জাঈ লো।"

"এমন নহেন তিনি তেমন গো, কেমন করিয়া সেই গম্ভীর কথা বলিব গো। যদি বলি তিনি অন্তরে আছেন, তবে বিশ্ব-জগৎ লজ্জায় পড়ে—যদি বলি তিনি বাহিরে, তবে যে সে কথা মিথ্যা হয় গো। বাহির ভিতর সকলকেই নিরন্তর করিয়া আছেন—চেতন অচেতন এ দুই তাঁহার পাদপীঠ। তিনি দৃষ্টও নহেন তিনি প্রচ্ছন্নও নহেন, তিনি প্রকটও নহেন অগোচরও নহেন। বাক্যে যে সে বলা যায় না গো।"*

* যুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন কর্ত্তৃক অনুবাদিত কবীরের বাক্যাবলী।

এ সকল উক্তি নৈতিকবোধমাত্রের ন্যায় কোন খণ্ডতার বোধের উক্তি নয়, পরন্তু পরিপূর্ণ অধ্যাত্মবোধের উক্তি। এই উক্তিই ভারত-বর্ষের, এ কথা আমাদের নিশ্চয় জানিতে হইবে। আমাদের শেষ লক্ষ্য কেবল অন্তহীন শক্তি ও উন্নতি লাভ নহে,—আমাদের শেষ লক্ষ্য সমগ্র সত্তার সঙ্গে সমগ্র জীবনের যোগ।

"বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেই খানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"

বাহির ভিতরকে নিরন্তর করিবার সাধনাই সকলের চেয়ে সত্যতম সাধনা এবং বৃহত্তম সাধনা, এই কথা আমাদের দেশেই বলা হইয়াছে।

কত যুগ ধরিয়া চৈতন্যময় জীব এই পৃথিবীতে আপনার পরিবেষ্টনের সম্পূর্ণ উপযোগী হইবার জন্য কত সংগ্রাম করিয়া ক্রমাগত নানা বিশিষ্ট অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাইয়াছে। অবশেষে মানুষে আসিয়া আত্মচৈতন্য জিনিসটা উদ্ভূত হইয়াছে। এই আত্ম-চৈতন্যই কি কম সংগ্রাম, কম বিরোধ করিল? ভিতরের সঙ্গে বাহিরের, আপনার সঙ্গে আপনার চেয়ে যাহা বড় তাহার, আবার আপনার ভিতরে যে নানা বৃত্তি রহিয়াছে তাহাদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের কত লড়াই! সে সকল সংগ্রাম পার হইয়া আজ আবার আত্মচৈতন্য ছাড়িয়া বিশ্বচৈতন্যে উঠিবার জন্য মানবের মধ্যে প্রয়াস লক্ষিত হইতেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ ইহাকেই বিশ্ববোধ নাম দিয়াছেন। সেই চৈতন্যে উত্তীর্ণ হইলেই সকল সংগ্রামের অবসান, সকল বিরোধের সমাপ্তি।

সেই জন্য প্রবন্ধারম্ভেই আমি বলিয়াছি যে, আধুনিক যুগে পূর্ব্ব পশ্চিমে মিলিয়া বিশ্বমানব নামক একটি অখণ্ড বস্তুর জন্ম

লাভ হইতেছে। আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞানে আজকাল এই বিশ্ববোধের কথাই নানা দিক্ দিয়া জাগিয়া উঠিতেছে; আবার আমাদের দেশের আধুনিক সাহিত্য, কাব্য, শিল্প, ধর্ম্মসাধনা সমস্তই এই বিশ্ববোধের বৃহৎ ভাবের দ্বারা উদ্বোধিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে। কি আশ্চর্য্য, যে বিশ্বমানবের এই নূতন জন্মলাভের পরম মঙ্গলমুহূর্ত্তে আমরা জীবন ধারণ করিয়া আছি! গুটি হইতে প্রজাপতি বাহির হইলে বনের সমস্ত পুষ্পরাজির নিগূঢ় মর্ম্মকোষে যেমন একটা অননুভূত পুলক কোথা হইতে কাঁপিতে থাকে, তেমনি সমস্ত মানুষ এদেশে এবং বিদেশে এই বিশ্ববোধ, এই অখণ্ড প্রাপ্তির আনন্দানুভূতিময় জীবনে সকল খণ্ডতার সংস্কারের বাধা বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে বলিয়া সকল হৃদয়ের শতদলমর্ম্মকোষের মধ্যে তাহার বার্ত্তা কি আজ কম্পিত হইতেছে না?

ধর্ম্ম ও স্বাজাত্য

প্রাচীনকালে প্রায় সকল সভ্যদেশেই ধর্ম্মকে জীবনের অন্যান্য বিভাগ হইতে স্বতন্ত্র করিয়া সর্ব্বোচ্চে স্থাপন করিয়াছে। জীবনের সমস্ত বিচিত্রতা যেন একটি সমতলভূমি, ধর্ম্ম যেন তাহারি প্রান্তবর্ত্তী উত্তুঙ্গ গিরিশিখর। সেই শিখর হইতে ধ্যানধারা ভাবধারা নিঃসৃত হইয়া নিম্নভূমিকে শ্যামল ও উর্ব্বর করিয়াছে—সকল মনুষ্য তাহাতে পিপাসার জল ও ক্ষুধার অন্ন লাভ করিয়াছে এবং সেই অধ্যাত্ম পণ্যভার দেশবিদেশে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে। কিন্তু সাধারণ মনুষ্যের সাধ্য নাই যে তাহারা সেই ধর্ম্মগঙ্গাকে প্রবাহিত করায়,—

তাহার রহস্যময় উৎপত্তিস্থান তাহাদের অগোচর। ভগীরথের মত যাঁহারা দেবতার তুষারজটার ভিতর হইতে এই প্রাণধারাকে মর্ত্ত্যে লইয়া আসিয়াছেন, মনুষ্যাণাং সহস্রেষু সেই মহামনুষ্যগণকে এইজন্য লোকে ঋষি আখ্যা প্রদান করিয়াছে, তাঁহাদিগকে সেই উত্তুঙ্গ শিখরবাসী বলিয়াই জানিয়াছে এবং তাঁহাদের ভাব বা বাক্যকে নিজেদের পরিমিত বুদ্ধির মানদণ্ডের দ্বারা পরিমাপ করিবার প্রয়াসকে ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়াই গণ্য করিয়াছে।

বেদ বল, বাইবেল বল, কোরাণ বল, প্রাচীনকালে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকেই অপৌরুষেয় বলা হইয়াছে। ইহার কারণ, যে সকল মহাপুরুষ এই শাস্ত্রবাণীগুলিকে মনুষ্যলোকে দান করিয়াছেন, তাঁহারা বিশেষ ভগবৎপ্রেরণার বলেই যে তাহা করিতে সমর্থ হইয়াছেন, প্রাচীনকালের ধর্ম্মের মধ্যে ইহা একটি নিগূঢ় বিশ্বাস। ঈশ্বর স্বয়ং তাঁহাদের অন্তরে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের স্বচ্ছ দর্পণোপম নির্ম্মল চিত্তের মধ্যে তাঁহার সত্যসকলকে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার এই আত্মপ্রকাশ বা Revelationএর জন্য এই শাস্ত্রগুলি মানুষের চির অবলম্বনীয় হইয়াছে এবং শাস্ত্রবাক্যের উচ্চারয়িতাগণ মানুষের চিরপূজ্য হইয়াছেন। মানুষের সংসারে যত কেন পরিবর্ত্তন ঘটুক্‌না, এই বাক্য অনাদি ও শাশ্বত—ইহার পরিবর্ত্তন কদাচ ঘটিবার নহে।

বহুকাল পর্য্যন্ত সকল ধর্ম্মেই এই অতিপ্রাকৃত বা অপৌরুষেয় বাদ চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি তাহাকে আর রক্ষা করা চলিতেছে না। ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানবিজ্ঞান ও ইতিহাসের অতি দূরবিস্তারী আলোচনার ফলে অতিপ্রাকৃত ও প্রাকৃতের ব্যবধান অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কৌতূহলী মানুষ যেমন বিজ্ঞানের জাল পাতিয়া দীপমক্ষিকার মত আকাশের অগণ্য গ্রহতারকাকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, তেমনি অধ্যাত্ম গিরিশিখরেও উঠিবার মত পথঘাট

প্রস্তুত করিয়াছে এবং আপনার অনুসন্ধানকে ধর্ম্মের বিশ্বপ্লাবিনী ধারার উৎপত্তিস্থান পর্য্যন্ত চালনা করিয়া তাহার সকল রহস্য ভেদ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোন জিনিসকেই সে আর মানুষের বুদ্ধির অনধিগম্য রাখিতে রাজি নয়। শিখরসন্নিকটস্থ কৃত্রিম ধর্ম্মরক্ষকের দল তারস্বরে তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন ও নিষেধ করিতে থাকিলেও সে নিরস্ত হইবে না—সে মাপামাপি করিবে, পথ বসাইবার আয়োজন করিবে, রহস্যকে ফাঁস করিবে, এইরূপ তাহার অভিপ্রায়।

শুধু এই কালেই যে প্রাকৃতে ও অতিপ্রাকৃতে—স্বকীয় বুদ্ধিতে এবং দৈব প্রেরণায়—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Reasonএ এবং Revelationএ ধর্ম্মজগতে এই দ্বন্দ্ব বাধিয়াছে তাহা নহে; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালেও বহু বহুবার এ ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে। এই ভারতবর্ষে বেদবিরোধী ধর্ম্মান্দোলন কি একবার জাগিয়াছে? কত বারম্বার। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানই তো তার মস্ত সাক্ষী। তার পর মধ্যযুগে যে সকল সাধুভক্ত ধর্ম্মকে কৃত্রিম বাহ্য আচার ও নিয়ম হইতে মুক্তিদান করিয়া সকল মানুষের অধিগম্য করিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই শাস্ত্র বা ঋষির দোহাই মানেন নাই। খৃষ্টানধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত বাদের বিরুদ্ধেও রেফরমেশনের কালে, ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় কত আন্দোলন হইয়া গিয়াছে। মুসলমানধর্ম্মের ইতিহাসেও ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এ যুগে যেমন করিয়া মানুষ ধর্ম্মের অতিপ্রাকৃত ভাবকে অস্বীকার করিয়াছে, শাস্ত্রকে অভ্রান্তরূপে মানা যেমন অসম্ভব ও অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছে—এমন আর কোন যুগে করে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে যখন মানুষ শাস্ত্রকে আঘাত করিয়াছে, তখন তাহার কারণ এই যে সে আত্মার

স্বাধীন ভাবের সঙ্গে বাহিরের অভ্যস্ত আচারের একটা বিরোধ অনুভব করিয়াছে। ধর্ম্মকে যাঁহারা টাট্‌কাটাট্‌কি রকম লাভ করিতে চান্ তাঁহারা কখনই আচারকে আশ্রয় করিয়া তৃপ্তি পান্ না—তাঁহারা তাই বলিয়াছেন, 'The letter killeth'—আচার ধর্ম্মের প্রাণঘাতী। সুতরাং তাহাকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র আপনার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে সত্যকে তাঁহারা আকর্ষণ করিয়া আনেন এবং সেই নির্ম্মল বোধপ্রসূত সত্যামৃত সকলকে পান করাইয়া পরিতৃপ্ত করিয়া দেন্। কিন্তু এ যুগে সেইরূপ বিশেষ বিশেষ মহাত্মার বাহ্য আচারের পীড়ন হইতে ধর্ম্মকে মুক্তিদানের প্রয়াসের জন্যই যে অতিপ্রাকৃতবাদের ভিত্তি শিথিল হইয়াছে তাহা নহে। এ যুগে বিজ্ঞান সমস্ত জড়জগতের ন্যায় মানসজগৎকে এবং অধ্যাত্মজগৎকেও একটি অভিব্যক্তির লীলাক্ষেত্ররূপে দেখিতেছে; মানুষের ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে যে একটি ঐতিহাসিক ক্রমপরম্পরা বিদ্যমান এই আভাস লাভ করিয়াছে। তাই ধর্ম্মের ইতিহাসে নানাকালের নানা স্তর একে একে চোখের সামনে উপস্থিত হইতেছে এবং শুধু এক দেশের ধর্ম্ম নয়, সকল দেশের ধর্ম্মের মধ্যেই এরূপ একটি ঐতিহাসিক স্তরপর্য্যায় আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। সুতরাং বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মাত্মা মহাপুরুষের আবির্ভাবের জন্য নয়, কিন্তু এই ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রসরতার জন্যই ধর্ম্মবিশ্বাস এক্ষণে আর প্রাচীনকালের ন্যায় তাহার অপৌরুষেয় ভাব বজায় রাখিতে সমর্থ হইতেছে না। তাহাও বিজ্ঞানের সামিল হইয়া ইতিহাসের সামিল হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কালে তাহার নানা অবস্থা-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া কার্য্যকারণের সূত্র টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ধর্ম্মকে যুক্তিদ্বারা বুঝা যায় না, কেবল নির্ব্বিচারে মানিয়া লইতে হয়—এ কথা আর এ যুগে টেঁকে কোথায়?

আমি জানি যে ধর্ম্মকে এরূপ ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীর দ্বারা আলোচনা করিয়া দেখিতে আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক এখনও ভয় পাইয়া থাকেন! তাঁহারা বলেন যে ওসব পাশ্চাত্য আদর্শ আমরা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নই। আমাদের ধর্ম্ম ঋষিরা ঈশ্বর সাক্ষাৎকারে তাঁহারি নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের প্রেরণাপ্রসূত বাণী। আমাদের সকল প্রাচীন দর্শনকারগণ সেই শাস্ত্রবাণীকে শিরোধার্য্য করিয়া নিজ নিজ ভাবে তাহারি ভাষ্য লিখিয়াছেন। বেদান্তশাস্ত্র লইয়া কত দার্শনিক মতামতের সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু কেহই কি শ্রুতিকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন? শ্রুতির উপরেই যে সকলের ভিত্তি। যে সকল মনীষী ঋষিবাক্য স্বীকার করেন নাই,—যেমন ধরা যাক্ বুদ্ধদেব,—তাঁহাদের ধর্ম্মমত ভারতবর্ষে এইজন্য টেঁকে নাই। তারপর মধ্যযুগে যাঁহারা বেদকে গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারা পুরাণকে মানিয়াছেন—পুরাণও বেদের চেয়ে কম নয়। বেদতো বহু প্রাচীন—পুরাণের ধর্ম্ম ও আচার প্রভৃতিই আমাদের আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দু আচার। এইজন্য দেখ ভগবান শঙ্করাচার্য্য যদিচ শ্রুতিকে ভিত্তি করিয়া অদ্বৈতমত প্রচার করিলেন, তথাপি পৌরাণিক প্রতীকোপাসনাকে একেবারে উড়াইয়া দিলেন না। রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদূ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সাধুগণ যে সকল পন্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বেদবাদী না হইলেও বিশেষ ভাবে হিন্দু, কারণ তাহা পৌরাণিক ধর্ম্মেরই বিচিত্র শাখাপ্রশাখা। মধ্যযুগের এই ভক্তিধর্ম্মগুলির মূল পুরাণে, সেই এক মূল হইতে কত শাখাপ্রশাখা বাহির হইয়া পুষ্পপল্লবে আকীর্ণ হইয়া এই যুগধর্ম্মকে একটি মহামহীরুহে পরিণত করিয়াছে।

পশ্চিমের বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রণালীকে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে যাঁহারা নারাজ, তাঁহারাই উপরে যে যুক্তির

নমুনা দিলাম সেই প্রকার যুক্তিকে অবলম্বন করিয়া থাকেন। অথচ তাঁহাদের বাক্যের মধ্যে যে সকল অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ থাকিয়া যায়, তাহা তাঁহাদিগকে চোখে আঙুল দিয়া না দেখাইয়া দিলে তাঁহারা দেখিতে পান না, এবং দেখাইয়া দিলেও যে অমনিই তাঁহাদের দৃষ্টি ফোটে তা নয়। অবশ্য অনেক সময় তাঁহারা যে দেশকে ভালবাসিয়াই এরূপ কার্য্য করেন তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু তাঁহারা যে বিজ্ঞান ও ইতিহাসকে ঠেকাইতে চান তাহার প্রধান কারণই তাঁহাদের ভয়—পাছে রত্নভ্রমে অতীতকালের যে সকল আবর্জ্জনা তাঁহারা বুকে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছেন, সেগুলি আবর্জ্জনা বলিয়াই ধরা পড়ে। সেইজন্য উঠিয়া পড়িয়া কোমর বাঁধিয়া বিজ্ঞান ও ইতিহাসের প্রবেশদ্বারে অর্গল লাগাইয়া ও নানা কূটযুক্তির সতর্ক পাহারা সেখানে বসাইয়া দিয়া তাঁহারা সেই মায়াগুলিকে জঞ্জালগুলিকে বুকে চাপিয়া আছেন। কিন্তু এতৎ-সত্ত্বেও তাঁহাদের অচলায়তনের প্রাচীর যে এ কালের আঘাতে নানা জায়গায় ফুটা হইতে সুরু করিয়াছে, তাহা দেখিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

ইংরাজ মনীষী হর্বার্ট স্পেন্‌সার তাঁহার 'ষ্টাডি অব্ সোসিয়লজি' গ্রন্থে সমাজবিজ্ঞানকে জীববিজ্ঞানের মত করিয়া আলোচনা করিবার অন্তরায়গুলি কি কি তাহা একে একে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মানুষের যে সকল সংস্কার তথ্য নির্দ্ধারণে ব্যাঘাত জন্মায় এবং বিচারকে অন্ধ করিয়া দেয়, যাঁহাদের জন্য সামাজিক ব্যাপার সম্বন্ধে কোন সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া পরম ক্লেশসাধ্য হইয়া উঠে, হর্বার্ট স্পেন্‌সার তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করিতে গিয়া অনেকগুলির মধ্যে দুইটি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন। একটি স্বাদেশিকতার সংস্কার, অন্যটি ধর্ম্মমতের গোঁড়ামির সংস্কার। স্বাদেশিকতার

দোষ এই যে, তাহা নিজের দেশ ছাড়া অন্যদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচারে যাইতে দেয় না—সত্যকে সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবার পক্ষে এইজন্যই তাহা অন্তরায় হয়। ধর্ম্মমতের গোঁড়ামি মতবিশেষকে সকল মানুষ, সকল অবস্থা ও সকল কালের পক্ষে সমান উপযোগী বলিয়া বিবেচনা করে। ইহা ভুলিয়া যায় যে তাহার মূল্য আপেক্ষিক মাত্র—বিশেষ স্থানকালপাত্রেই তাহা খাটে এবং ভিন্ন স্থানকালপাত্রে পড়িলে তাহা স্বীয় রূপের পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়।

যাঁহারা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ধর্ম্মকে আলোচনা করিতে চাহেন না, তাঁহারা যদি চিন্তা করিয়া দেখেন তবে দেখিবেন যে স্পেন্সার-কথিত ঐ সংস্কারদ্বয় তাঁহাদের মধ্যে প্রবল থাকায় তাঁহারা ইতিহাসকে ধর্ম্মের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দেখিতে পারিতেছেন না। প্রথমতঃ তাঁহারা মনেও করেন না যে পৃথিবীতে আরও অন্যান্য যে সকল ধর্ম্ম রহিয়াছে তাহাদের সহিত তুলনা না করিলে কোন ধর্ম্মের ভিতরকার যথার্থ সত্যটি কি তাহা কখনই স্থিরীকৃত হইতে পারে না। সত্য যদি কেবলমাত্র ভাবগত হইত, বস্তুগত না হইত, তবে আত্মানুভূতিই সত্য নির্দ্ধারণের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু সত্যের নানা বাহ্যপ্রকাশের মধ্য হইতে তাহার অখণ্ড স্বরূপটিকে আবিষ্কার করিতে হয় বলিয়া যেখানে যেখানে সত্যের প্রকাশ, সেইখানে সেইখানে উপকরণ সংগ্রহ করিতেই হয়। যেমন আকর্ষণের নিয়ম কেবলমাত্র যদি আপেল ফলের মাটিতে পতনের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিত তবে তাহাকে সত্য বলিতাম না,—কিন্তু যখন দেখা যায় যে সূর্য্যচন্দ্র গ্রহলোক পর্য্যন্ত সেই নিয়মের প্রসার, তখনই বলি এ নিয়ম বিশ্বনিয়ম এবং সত্য নিয়ম। অন্য ধর্ম্মের সঙ্গে নিজের ধর্ম্মকে সেই কারণেই মিলাইয়া দেখা দরকার। কিন্তু কেমন করিয়া সে

কার্য্য সাধিত হইবে ?—এই প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক। মতের গোঁড়ামি বলিয়া যে দ্বিতীয় বাধা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা থাকিলে এরূপ কাজ কিছুমাত্র হইয়া উঠাই অসম্ভব। কারণ এক ধর্ম্মের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের তুলনা করিলেই কোন্‌টা ধর্ম্মের নিত্যদিক্ এবং কোন্‌টা সাময়িক দিক্ তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না—ইতিহাসের ভিতর দিয়া না দেখিলে এরূপ তুলনা কোন ফলদায়ক হইবার নহে। সুতরাং যে কোন বিষয়েই আমরা সত্যান্বেষণ করিব সেখানেই নিপুণ ও সতর্কভাবে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজন, তারপর তাহাদের মধ্যে কোন চিরন্তন নিয়ম কাজ করিতেছে কিনা তাহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী আশ্রয়ে দেখা প্রয়োজন। নিজের দেশকেই একান্ত করিয়া জানা এবং নিজের ধর্ম্মমতকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিবেচনা করা এই দুই সংস্কার এরূপ ভাবে সত্যনিরূপণের বিষম বাধা—সুতরাং ইহাদিগকে ছাড়াইয়া না উঠিলে নয়।

তথাপি কেহ যদি বলেন যে অন্য ধর্ম্মকে আমি মানিতে চাই না, তাহাকে আমি ভয়াবহ জ্ঞান করিয়া স্বধর্ম্মে নিধনই শ্রেয় জ্ঞান করিব, আমার তুলনা করিয়া ইতিহাস মিলাইয়া সত্য যাচাই করিবার আবশ্যকতা কি, ইত্যাদি—তবে ডাক্তার জন্‌সন্ একজন মহিলাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই বলিতে হয় "Madam, I can give you reasons but not understanding"—আমি আপনাকে যুক্তি দিতে পারি কিন্তু বুদ্ধি দিতে তো পারি না। ভাল, তিনি না হয় নিজের দেশের ধর্ম্মের মধ্যে তাঁহার দৃষ্টিকে আবদ্ধ রাখুন—তিনি বেদকেও মানেন অথচ পুরাণকেও মানেন—উপনিষদের ব্রহ্মবাদকেও অস্বীকার করেন না, অথচ পৌরাণিক দেবদেবীতেও তাঁহার অশ্রদ্ধা আছে—ইহাদের মধ্যে কি কোন বৈষম্য নাই, কোন অসামঞ্জস্য নাই এবং তাহারই কি কোন কারণ নাই ? তিনি

কি অনুসন্ধান করিয়া দেখা আবশ্যক মনে করেন না যে কেন এক সময়ে যে ব্রহ্ম ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বড় বলিয়া বিজিজ্ঞাসিতব্য হইয়াছিলেন তিনি নানা দেবদেবীর আবির্ভাবে আর স্থান পাইলেন না? তাঁহার আপনার দেশের ধর্ম্মের এই গুরুতর পরিবর্ত্তনের কারণ কি, তাহা ইতিহাসের দিক হইতে কি আলোচনা করিতে হইবে না? ভারতবর্ষে কালে কালে থাকিয়া থাকিয়া যে সকল ধর্ম্মবিপ্লব দেখা দিয়াছে তাহাদের কারণ কি—প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে তাহাদের বিরোধ হইল কেন—এবং আজও পর্য্যন্ত যে সেই বিপ্লবের বহ্নি নির্ব্বাপিত না হইয়া পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তাহা যে পুরাণের অপেক্ষা পুরাণতর উপনিষদের মধ্যে আপনার অভীপ্সিত বাণী লাভ করিল এবং পৌরাণিক দেবদেবীকে অস্বীকার করিল—ইহাও কি একটা দুঃস্বপ্নমাত্র? এই আন্দোলন সকলের মধ্যে কার্য্যকারণের নিয়ম কি কাজ করিতেছে না—ইহাদের সম্বন্ধে কি চোখ বুজিয়া উদাসীন হইয়া থাকা কোনমতেই চলে?

এই স্বাদেশিক হিন্দুধর্ম্মের গোঁড়াদের অন্ধ জড়তার প্রতিবাদ করিতে গিয়াই আমি আমার আলোচ্য বিষয়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। ধর্ম্মের সঙ্গে দেশীয় ভাবের যোগ কোথায়, ইহাই অদ্য আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। সেই জন্যই ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক্ হইতে আলোচনার আবশ্যকতার কথা এত করিয়া পাড়িলাম। ভারতবর্ষে স্বাজাত্য (Nationality) বস্তুটিও ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ফলস্বরূপ, তাহাকে একটা ভাবুকতামাত্র মনে করিলে ভুল হইবে। তাহাকে ভাল করিয়া বুঝা এবং ধর্ম্মকে ভাল করিয়া বুঝা একই প্রণালীর উপর নির্ভর করে,—যদি সেই প্রণালীটিকেই গোড়ায় অস্বীকার করা হয় তবে উভয়েরই মূলেই কুঠারাঘাত করা হয়।

অতএব স্বাজাত্য (Nationality) বস্তুটি কি এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক্। তার পরে দেখা যাইবে ধর্ম্মের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ কোথায় এবং কিরূপ।—স্বাজাত্যের ভাবটির ক্রমবিকাশ সম্যক্ উপলব্ধ হইলে দেখা যাইবে যে ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ধারা তাহারি সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে,—শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষে একে অপরের বিকাশের সাহায্য করিয়াছে। ধর্ম্মই ভারবতর্ষে স্বাজাত্যের প্রতিষ্ঠাবর্দ্ধক, স্বাজাত্য ধর্ম্মের উপলব্ধির সহায়—উভয়ে উভয়কে ছায়া-তপের মত আশ্রয় করিয়া অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছে।

আমরা জানি, নেশন্ শব্দটা ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রয়োগ করিতে ইউরোপীয়গণ আপত্তি করেন এবং আমরাও অনেকে তাঁহাদের সেই মতের সমর্থন করিয়া থাকি। তাঁহারা বলেন 'ইণ্ডিয়া' একটা ভৌগোলিক নামমাত্র—গ্রীক্‌রা সিন্ধুদেশকে ইণ্ডাস্ বলিত, সেই কথা হইতে ইণ্ডিয়ার উৎপত্তি। ইহার ভৌগোলিক সীমানাও এমনি সুনির্দ্দিষ্ট যে ইহার স্বাতন্ত্র্যকে কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। শুধু তাই নয়, ইহার জলবায়ু বিচিত্র, ভূগঠন বিচিত্র, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুও বিচিত্র—আর সেইজন্য মনুষ্যজাতিরও বিচিত্র সমাবেশ এই দেশে বরাবর ঘটিয়াছে। এই জাতিবৈচিত্র্য জগতের আর কোথাও নাই। অতএব সেই কারণেই 'নেশন' নামক এক কলেবরবদ্ধ এক মহাজাতি এই বিপুল দেশে সম্ভব হয় নাই। প্রথমে দেখ, আদিমকাল হইতে কৃষ্ণকায় আর্য্যগণ এদেশে বাস করিত—তাহাদের মধ্যে দুই দল—একদল অপেক্ষাকৃত সভ্য দক্ষিণবাসী দ্রাবিড় অনার্য্যকুল; অন্য দল—কোল ভীল সাঁওতাল নাগা কুকী প্রভৃতি অসভ্যগণ। আর্য্যগণ সিন্ধুদেশে আসিয়া যখন হইতে অরণ্য পরিস্কৃত করিয়া কৃষিক্ষেত্র ও জনপদ সকল স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন বিজিত অনার্য্যগণ শূদ্র

নামে আর্য্যসমাজের নিম্নস্তর অধিকার করিয়াছিল। আর্য্যে অনার্য্যে সেই প্রাচীনকালে যে রক্ত-সম্মিশ্রণ ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তর প্রমাণ প্রাচীন গ্রন্থসমূহে বিদ্যমান। তার পরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবকালে বেদ ও ব্রাহ্মণ অবজ্ঞাত হইলে এই নিম্নশ্রেণীয় শূদ্রজাতি যে মাথা জাগাইয়া উঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন কোথায় আর্য্যকুলপ্রদীপ রাজগণ—তাহার পরিবর্ত্তে মৌর্য্যবংশের প্রবলপরাক্রমের কথা শ্রবণ করি। অথচ এই মৌর্য্যরাজগণ স্পষ্টতই হীনজাতিসম্ভব ছিলেন। বৌদ্ধযুদ্ধের অবসান কালে আর্য্যধর্ম্মের যখন বিলোপ হইয়া গিয়াছে এবং বৌদ্ধধর্ম্ম নানা অনার্য্য দেবদেবীপূজা ও তন্ত্রমন্ত্রের আক্রমণে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন শক, হূণ, মঙ্গল প্রভৃতি নানা বাহিরের জাতি আসিয়া সমাজে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়াছে। ভারতবর্ষে শকরাজা হূণরাজা রাজত্ব করিয়াছেন। সেই সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও ধর্ম্মবিপ্লবের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান জাগিয়াছিল, তাহাতে একদিকে জ্ঞানীগণমধ্যে প্রাচীন ব্রহ্মতত্ত্ব-অদ্বৈতবাদ প্রচারিত হইল এবং অন্য দিকে প্রাকৃত সাধারণের মধ্যে সকল দেবদেবী আর্য্যসভ্যতার ভাবের দ্বারা শোধিত সংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক গৃহীত হইলেন। এই জন্য ইতিহাসে এই পৌরাণিক যুগকে ধর্ম্মের পুনরুত্থানের যুগ বলিয়া থাকে। তখন ধর্ম্মে যেমন বিচিত্র দেবদেবী খাড়া হইলেন, সমাজে তেমনি কর্ম্মানুসারে বিচিত্র জাতিতন্ত্রের সৃষ্টি হইল। এইরূপে জাতিসঙ্করের প্রক্রিয়াও একপ্রকার বন্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ স্বীকার করুন আর নাই করুন, এই হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান কালেই ভারতবর্ষ আপনার ন্যাশন্যাল সত্তাকে বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিল। প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের সংঘাত এই যুগে যেরূপ সুতীব্র হইয়াছিল, তাহার সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়াসও সেইরূপই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল। ভারতবর্ষ নামটা

যে একটা ভৌগোলিক নাম মাত্র নয়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি যখন ভাবিয়া দেখি যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য 'মহাভারত' এই বৃহৎ নাম লাভ করিয়াছে! মহাভারতের মধ্যে সমস্ত দেশ আপনার অনেক যুগের বহু বিচিত্র লোককাহিনী ও ইতিহাসকে সংবদ্ধ করিয়াছিল—প্রাচীন কালে যখন কোন লিপিবদ্ধ ইতিহাস ছিল না তখন ঐ বিচ্ছিন্ন কাহিনীগুলিই লোকমুখে ইতিহাসের স্থান লাভ করিয়াছিল। এ দেশের প্রাচীন সমাজে চতুর্ব্বর্ণের পরস্পরের সম্বন্ধ, রাজা-প্রজার সম্বন্ধ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও যুদ্ধ বিগ্রহ, গার্হস্থ্য জীবন, আশ্রম জীবন ও তপোবনের চিত্র—সকলের পরিচয় ঐ এক মহাগ্রন্থ বহন করিতেছে। এমনকি সকল দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয় যে অপূর্ব্ব গ্রন্থটিতে ঘটিয়াছে সেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও মহাভারতের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। নিশ্চয় ভারতবর্ষ আপনার ভারত নামকে বিশেষ ভাবে স্বাজাত্যের সংজ্ঞারূপে অনুভব করিয়াছিল, নহিলে কখনই যে গ্রন্থ তাহার পরিচয় সর্ব্বতোভাবে এবং সকল দিক্ দিয়া বহন করিয়াছে তাহাকে 'মহাভারত' এই নাম সে দিতনা। ভারতের সকল সাধনা, চিন্তা ও ইতিহাস সমস্তই উহার মধ্যে ধরা দিয়াছে—দেশের সমগ্র চিত্তের প্রতিবিম্বের মতই উহা বিরাজমান। ব্যাস শব্দের অর্থ পরিমাণ, বেদ শব্দের অর্থ জ্ঞান—যিনি আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠজ্ঞানকে পরিমাণ করিয়াছেন, যিনি তাহাকে একত্র করিয়াছেন তিনিই বেদব্যাস ও মহাভারতকার—এই জন্য চতুর্ব্বেদের পর মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়। ভারতবর্ষ এই নাম এবং এই নামে নামপ্রাপ্ত ভারতের মহাগ্রন্থ 'মহাভারত' বিশেষ ভাবে ভারতবর্ষের স্বাজাত্যবোধের নিদর্শনস্বরূপ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মহাভারতের কাল নির্ণয় সম্বন্ধে অনেক তর্কবিতর্ক আছে; কিন্তু যে যুগে ভারত আপনাকে প্রাচীনের সঙ্গে বিশেষভাবে সঙ্গত করিয়াছে সেই যুগে যে সে আপনার সকল লোক-গাথা, সকল কাহিনী, সকল দর্শনশাস্ত্র,

পরিমাণ করিয়া এক করিয়া লইয়াছে ইহা মনে করিলে তবেই এত বড় গ্রন্থের একটা যথার্থ গৌরব রক্ষা করা হয়। যাহা হৌক্ সে ঐতিহাসিকের বিচার্য্য বিষয়। আমাদের বক্তব্য সুধু এই যে ভারতবর্ষকে যাঁহারা কেবল একটা স্থান মাত্র বলেন, যে স্থানে নানা জাতি আসিয়া ভিড় করিয়া আছে—এক কলেবরবদ্ধ বিরাট্ মহাজাতি বা নেশন হয় নাই—তাঁহারা ইহার এই পূর্ব্ব ইতিহাসকেই ভাল করিয়া দেখিতে পান্ না।

তবে এখানে একটা কথা উঠিবে যে জ্ঞানের বা সাধনার একটা ধারাবাহিকতা থাকিলে এবং তাহার বোধ থাকিলেই কি দেশবিশেষে নেশন বস্তু আছে এরূপ কল্পনা করা যায়? মানিলাম না হয় যে ভারতবর্ষে যে ঐক্যটি হইয়াছে তাহা জ্ঞানের একটি অখণ্ড ধারার দিক্ দিয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ইহার মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত বিচিত্র জাতি-দিগকে তো এক করিয়া তুলে নাই। আজিও ভারত কত জাতি ও উপজাতিতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদের মিলনের সূত্র কোথায়? তার পর হিন্দু ছাড়িয়া দিলে মুসলমান আছে, খৃষ্টান আছে—ভারতবর্ষের বিপুল জনসংখ্যায় তাহাদের স্থান সামান্য নহে। তাহাদের মধ্যে তো সেই জ্ঞানধারার ঐক্য-প্রবাহ নাই—সেখানে যে একেবারেই বিচ্ছেদ।

ইউরোপে প্রাচীন গ্রীস রোম হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যযুগের পুরোহিততন্ত্রের মধ্য দিয়া যে একটি জ্ঞানের ও সাধনার প্রবাহ বহিয়া আসিয়াছে, বর্ত্তমানকালের বিজ্ঞান দর্শন প্রভৃতি তাহারি দ্বারা কত পরিপুষ্ট! সুতরাং কেবলমাত্র চিন্তা ও সাধনার ইতিহাস আলোচনা করিলে সমগ্র ইউরোপকে এক ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। অথচ আমরা দেখি রাষ্ট্রীয় ইতিহাস প্রত্যেক দেশেরই স্বতন্ত্র—সেখানে ইংলণ্ড ফ্রান্স জর্ম্মাণী প্রত্যেকেই আপন আপন বিশিষ্টতা রক্ষা করিতেছে। তাই আমরা ইউরোপকে তো এক নেশন বলিতে পারি না—সেখানে

অনেক স্বতন্ত্র নেশন আছে এই কথা বলি। তবেই দেখা যায় যে নেশন বলিতে বিশেষভাবে স্বারাজ্য বুঝায়। বহুকাল হইতে যে জনগণ এক সুখদুঃখ বিপদসম্পদ ভোগ করিয়া এক স্বারাজ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পর সম্মিলিত হইয়াছে, তাহারা ভাষা, ধর্ম্ম, জাতি এবং সর্ব্বপ্রকার ব্যবধান সত্ত্বেও এক নেশন। জর্ম্মাণরাজ্যের প্রান্তসীমায় জর্ম্মাণ অধিকারে যে সকল ফরাসী বাস করে, তাহারা জর্ম্মাণ জাতি—সুইজারল্যাণ্ডে যে সকল ভিন্নভাষী লোক বাস করে তাহারা সুইস্। তাহার কারণ তাহারা এক পোলিটিক্যাল শাসনে বাস করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের স্বত্ব স্বাধীনতা এক, সুখদুঃখ এক, ইতিহাস এক। ভারতবর্ষে যখন স্বারাজ্যের কোন চিহ্নমাত্র নাই—এদেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতি যখন এক রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করিয়া এক অভিন্ন কলেবর হইয়া উঠে নাই, এখানে সমাজ যখন জাতিভেদ সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছে—তখন এখানে নেশন বস্তু আছে এ কথা কল্পনা করা চলে কি?

আমি এ কথা খুবই মানি যে নেশনের ইউরোপীয় সংজ্ঞা অনুসারে ভারতবর্ষে নেশন নাই এবং কখনও ছিল না। কিন্তু যদি বল যে প্রাচীনের সঙ্গে নবীনের একটা অঙ্গাঙ্গীযোগের বোধ এবং সেই বোধহেতু এক দেশের লোকের পরস্পরের মধ্যে একটা ঐক্যানুভূতির ক্ষীণ নিদর্শন কোন একটা নাম পাইবার অধিকারী—নেশন তাহাকে বল আর নাই বল—তবে ভারতবর্ষের নিঃসন্দেহ সে অধিকার আছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পর্ব্বগুলি স্বপ্নের মত বিচ্ছিন্ন নয়—তাহারা এক বড় পরিণামের সূত্রে গাঁথা। চিন্তার দিক্ দিয়া সাধনার দিক্ দিয়া, একটা ক্রমপরম্পরা ইহার ইতিহাস রক্ষা করিয়াছে এবং সেই পরম্পরার মধ্য দিয়া ইহার অন্তর্নিহিত একটি গভীর অভিপ্রায় আপনাকে প্রকাশ করিয়াছে। আমরা ভারতবর্ষ বলিতে একটা বিশেষ আইডিয়া বুঝি যাহা

ইউরোপের বা আর কাহারও নয়—যাহার উপলব্ধি এই দেশেই বিশেষ করিয়া ঘটিবে এবং এই কালেও ঘটিতেছে। যদি ভারত-বর্ষে কতগুলি বিচ্ছিন্ন জাতি বাস করে এই কথাই সত্য হইত, তবে তাহার ইতিহাস অনুধাবনযোগ্য ইতিহাসই হইত না এবং তাহাকে বর্ব্বরের ইতিহাস বলিয়া ঠেলিয়া রাখিলেও কোন অন্যায় হইত না।

ভারতবর্ষের সেই বিশেষ আইডিয়াটি কি? এই প্রশ্নটিই এ কালে আমাদের দেশের আধুনিক মনস্বীগণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং ইহার ইতিহাসের ভিতর হইতে তাহার উত্তর আদায় করিবার চেষ্টা করিতেছেন। ব্রাহ্মসমাজের পূজ্যপাদ আচার্য্যগণের কথা ছাড়িয়া দিলে, আধুনিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া কত কত চিন্তাশীল ও পণ্ডিত ব্যক্তি এই প্রশ্নেরই মীমাংসা করিবার প্রয়াসী হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যে মতামতের যত বৈষম্যই থাকুক্, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে পোলিটিক্যাল ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস নয়, সে দিক্ দিয়া তাহার ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে তাহাকে কিছুই বুঝা যাইবে না। অবশ্য তাঁহারা অনেকেই ভারতবর্ষের সামাজিক ইতিহাসকে খুব উচ্চ আসন প্রদান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষে জাতিভেদ আছে কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ব্যবস্থায় যে সেই ভেদের কাঁটা দূর হইয়া গিয়াছে এই কথা তাঁহারা অনেকে বলিয়াছেন দেখা যায়। প্রত্যেক মানুষেরই নিজ জাতিরক্ষা করা ধর্ম্মরক্ষা করার মত, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এই একটি আদর্শ সমাজের মধ্যে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়া প্রতিযোগিতার বিষ একেবারে দূর করিয়া দিয়াছে এবং সকল মানুষকেই কর্ম্মে ও ভোগে অধীন করিয়া

ধর্ম্মে স্বাধীন করিয়াছে, এমনতর অনেক কথা তাঁহাদের মুখে আমরা শুনিয়াছি। আমার মনে হয় যে এ আলোচনা এক রকম আপনাকে ভোলানো বই আর কিছুই নয়, কারণ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বলিয়া চীৎকার করিলেও বর্ত্তমান সমাজে তাহার কোন চিহ্নই খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইবে। বৃত্তিভেদ এখন উঠিয়া যাইতেছে এবং ক্রমশ আরও যাইবে; সুতরাং যে প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জীবন নাই যাহা জীবশিলা মাত্র তাহা প্রত্নতত্ত্বের আলোচনার বিষয়ীভূত হইলেই ভাল হয়। কর্ম্মভেদ নাই অথচ জাতিভেদ আছে, এই একটা অত্যন্ত অসঙ্গত কাণ্ড এদেশে চলিতেছে। তার পর, কর্ম্মকে অমন করিয়া জাতিতে জাতিতে ভাগ করিয়া মানুষের শক্তিকে সঙ্কুচিত করিয়া তোলাও ভাল ব্যবস্থা কি না সন্দেহ। অতএব এ প্রকারের আলোচনায় নিজেদের ত্রুটির দিকে চোখ না পড়িয়া স্বাদেশিক অহঙ্কারই উগ্র হইয়া উঠে এবং এই অহঙ্কারে যে আমাদের সমাজে অনিষ্ট হয় নাই এ কথাই বা কে বলিবে?

সে যাহাই হোক আমরা এই সকল মনীষীদিগের আলোচনায় একটি কথা সুস্পষ্ট বুঝিয়াছি যে রাষ্ট্রে বা সমাজে ভারতবর্ষ বিশেষত্ব দেখাইতে না পারিলেও ধর্ম্মে তাহার বিশেষত্ব বরাবর আশ্চর্য্যরূপে তাহার সমস্ত ইতিহাসের মধ্য দিয়া ফুটিয়াছে। সেই ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্ম-সাধনার অভিব্যক্তির ইতিহাসই এক হিসাবে সমস্ত ভারতের ইতিহাস। সেই ধর্ম্ম বলিতে শুধু রিলিজন বুঝায় না—সমস্ত জীবনের সকল দিকই তাহার অন্তর্ভুক্ত—শিল্প, সাহিত্য, দর্শন সমস্তই তাহার ভিতরে। এক বিরাট কলেবরের সে প্রাণরূপী—আর সেই যে তাহার দ্বারা অনু-প্রাণিত সকল কালের বিভিন্ন প্রয়াসমালা এককলেবর প্রাপ্ত, তাহাতেই ভারতবর্ষের ভারতবর্ষীয়ত্ব বা নেশনত্ব বা যে নামই দিতে ইচ্ছা কর।

সমাজে যা কিছু বিপ্লব ভারতে ঘটিয়াছে তাহার মূলে এই ধর্ম্ম—ইহারি বিরাট স্বরূপটিকে সকল কালের মধ্যে দেখিতে পাওয়াই ভারতবর্ষকে দেখিতে পাওয়া।

সেইজন্যই এই কথা বলিয়া প্রবন্ধারম্ভ করিয়াছি যে এখন ধর্ম্মকে অতিপ্রাকৃত রাজ্যে ঠেলিয়া রাখা আর সম্ভবপর হইতেছে না। তাহার কারণ স্বাজাত্য বোধের যে নব প্রেরণা পশ্চিমের আঘাতে আমাদের দেশের হৃদয়ের মধ্যে জাগিয়াছে তাহার ভিত্তি যে ধর্ম্মেরই উপর, এই কথাটা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। সুতরাং ধর্ম্মকে আমাদের সমস্ত ইতিহাসের মাঝখানে সজীব সক্রিয় শক্তিরূপে অনুভব না করিলে, যুগে যুগে এই দেশে যে সকল আন্দোলন-বিপ্লব হইয়া গিয়াছে, তাহাদের গভীরতম কেন্দ্র স্থানে ইহার কার্য্য প্রত্যক্ষ না করিলে, আমাদের এই স্বাজাত্য বাষ্পের মত উঠিয়া বাষ্পেরই মত মিলাইবে। ধর্ম্মকে যদি অতিপ্রাকৃত করিয়া রাখি, তবে এদেশে তাহার বিচিত্র লীলার কোন অর্থই থাকিবে না। তবে আমাদের অত্যন্ত স্থূল জড়ত্বপূর্ণ যে সমদৃষ্টি যাহা বলে সকল ধর্ম্মই ধর্ম্ম এবং সকল পথই পথ—যাহা পবিত্রতম মহত্তম ধারণাকে হীনতম অজ্ঞ সংস্কারের পাশাপাশি বসাইতে লজ্জা বোধ করে না—সেই স্থূল একাকারত্বে সমস্তই পিণ্ড পাকাইয়া বিকৃত হইতে থাকিবে। বিশ্বমানবযজ্ঞে আমাদের দেশের কি যে বিশেষ দান তাহা আমরা জানিব না। এমন সকল মৃতভার আবর্জ্জনা আমরা সেই যজ্ঞবেদিকার নিকটে ধরিতে যাইব যাহা কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। ধর্ম্মকে সেইজন্য আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক প্রণালীতে আলোচনার আবশ্যকতার কথা পাড়িয়া এই প্রবন্ধারম্ভ করিয়াছি।

কিন্তু এ প্রণালী গ্রহণের বাধা কোথায় তাহাও পূর্ব্বেই ইঙ্গিত

করিয়াছি, যে জন্য যাঁহারা ভারতবর্ষের বিশেষ আইডিয়াকে উদ্ঘাটন করিবার ভার লইয়াছেন তাঁহারাও এই প্রণালীকে পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নাই, অংশতঃ লইয়াছেন মাত্র। সে বাধা হার্বার্ট স্পেন্সার যাহাকে স্বাদেশিকতার বাধা ও ধর্ম্মমতের গোঁড়ামির বাধা নাম দিয়াছেন। বিজ্ঞানতো সে সকল সংস্কারকে লেশ মাত্রও খাতির করিয়া চলিবে না—সকল সংস্কারের পাশ মোচন না করা পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে আলোচনাই সম্ভবপর হয় না। নিজের ব্যক্তিগত, সম্প্রদায়গত, মতগত, স্বাদেশিকতাগত, যত কিছু সংস্কার সত্যের পথরোধক—সমস্ত সরাইয়া যাহা প্রকৃত, যাহা খণ্ডদেশকালে আবদ্ধ নয় পরন্তু সর্ব্বদেশকালেই মেলে, সেই যথার্থ সত্যটিকে আবিষ্কার করিতে হইবে। সুতারাং খুব কসিয়া তথ্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে, তারপর তাহাদিগকে তুলনা করিতে হইবে, তারপর তাহাদের মধ্যে যে কার্য্যকারণের নিয়ম কাজ করিতেছে তাহাকে নিরপেক্ষ ভাবে দেখিতে হইবে, তারপর তাহাদের ভিতর হইতে কোন তত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায় কিনা তাহা জানিতে হইবে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী বলিতে ইহাই বুঝায় এবং ইহাকে ধর্ম্মের উপর যথার্থভাবে প্রয়োগ করিলে কূট ব্যাখ্যা দ্বারা যাহা কালের জঞ্জাল তাহাকে তাহার শ্রেষ্ঠরত্ন বলিয়া প্রতিপন্ন করা চলে না। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দেবদেবী উপাসনার উৎপত্তি ও প্রসারের কারণ নির্ণয় করিলেই তাহাদের স্থান এ কালে আর আছে কি না তাহা বেশ নিরূপিত হইতে পারিবে এবং ভারতবর্ষের ধর্ম্মের ইতিহাসে তাহাদের স্থান এককালে ছিল কেন তাহাও বেশ বুঝা যাইবে।

কিন্তু ধর্ম্মকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিবার যে কোন বিপদ নাই এ কথা পাশ্চাত্য দেশের ধর্ম্মদৌর্ব্বল্যের দিকে তাকাইয়া

আমরা আর জোর করিয়া বলিতে পারি না। ধর্ম্মবিজ্ঞান নামক একটা পদার্থ সৃষ্ট হইয়া উঠিলেই যে মনুষ্য সমাজে ধর্ম্মবোধ যথেষ্ট বলশালী হয়, পশ্চিম দেশ কখনই একথার সাক্ষ্য দিতে পারে নাই। ধর্ম্ম, বিজ্ঞানের সামিল হইয়া পড়িলে তাহার মধ্যে ভক্তির, বিস্ময়ের, অতীন্দ্রিয় চৈতন্যের বিষম অভাব লক্ষিত হয়—তাহা যে পরিমাণে বিজ্ঞান হইতে থাকে সেই পরিমাণে ধর্ম্মত্ব হারাইতে বসে। অধ্যাত্ম রাজ্যে যুক্তিকে একমাত্র রাজদণ্ড প্রদান করিলে ফরাসী বিপ্লবের কালে যে কাণ্ডটি ঘটিয়াছিল তাহাই অনিবার্য্যরূপে ঘটিতে থাকে। আমরা জানি ফরাসি বিপ্লবকারীগণ Mass Book ছিঁড়িয়া কার্টিজ পেপার তৈরি করা, পবিত্র পান-পাত্রে বা chaliceএ মদ্যপান এবং গির্জ্জার মধ্যে বসিয়া অসংযত আমোদউল্লাস প্রভৃতি অদ্ভুত উন্মত্ত আচরণের হাতে কেমন করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের যে একটা নির্ম্মল স্বাতন্ত্র্য আছে, বাহ্য অনুষ্ঠানকে বাদ দিলে যে তাহার সেই পবিত্রতাই আহত হয়, এ সকল চিন্তা তাঁহাদের মনেও আসে নাই। এইরূপে বিশুদ্ধ যুক্তি আশ্রয় করিলে সংস্কার ভাঙিতে গিয়া তাহার 'কু'র সঙ্গে সঙ্গে 'সু'কে সুদ্ধ কোপাইয়া সমভূম করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং পশ্চিম মহাদেশে বিজ্ঞান যে ধর্ম্মভাবকে অনেকটা পরিমাণে ম্লান করিয়াছে একথা ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস হইতে আজ পর্য্যন্ত সেদেশের ধর্ম্মের অবস্থা যে-কেহ পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তিনিই স্বীকার করিবেন। বাইবেল গ্রন্থ বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইয়া তাহার বারো আনা জিনিষ নানা জাতির সংসর্গাগত সংস্কার বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এমন কি খৃষ্টের জীবনের বাস্তবিকতা সম্বন্ধেই বহু সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। বাইবেলের সকল অক্ষরই যে ঈশ্বরের প্রেরণাসম্ভূত এ কথা আর এখন মানা চলে না।

বিজ্ঞানবিৎ অনেকেই তাই ধর্ম্মকে বাদ দিয়া চলাও যায় এমন কথা বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না।

ধর্ম্মকে অতিপ্রাকৃতের পর্ব্বতশিখর হইতে নামাইয়া আনিলেই প্রথম ধাকায় এই বিপদ আছে, ধর্ম্মের ভিত্তি শিথিল হয়। এবং মানুষের মনে প্রাচীন সংস্কারের পরিবর্ত্তে নূতন ভাব প্রকৃতির গভীর মূল পর্য্যন্ত যায় না—সে একটা বুদ্ধিতে মানিয়া লওয়া জিনিষ মাত্র হয়, সমস্ত হৃদয় তাহাতে সায় দেয় না। এই কারণেই এডমণ্ড বার্ক ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমস্ত আগাগোড়া নূতন করিয়া গড়িবার প্রস্তাবকে কঠিনভাবে আঘাত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন ঃ—"We are afraid to put men to live and trade each in his own private stock of reason, because we suspect that this stock in each man is small, and that the individuals would do better to avail themselves of the general bank and capital of nations and of ages."—অর্থাৎ আমরা মানুষকে নিজের নিজের ব্যক্তিগত যুক্তির পুঁজি সম্বল করিয়া জীবনধারণ ও ব্যবসায় করিতে দিতে ভয় পাই—কারণ আমরা জানি যে সে পুঁজি কতই সামান্য—আমরা তাই বলি যে, সকল যুগের এবং সকল জাতির যে সাধারণ ব্যাঙ্ক এবং মূলধন আছে—ব্যক্তিবিশেষ তাহাকেই আশ্রয় করিলে ভাল হয়। কথাটা তখন লোকের যতই খারাপ বোধ হউক্ এবং এখনও তাহা সম্পূর্ণতঃ সত্য না হোক্ এ কথা ঠিক যে মানুষ একলাই যে যুক্তিনহায় হইয়া সমুদ্র পাড়িদিতে পারে তাহা নয় এবং সেরূপ পাড়িদিবার চেষ্টা করিলে যে জাহাজ ডুবির সম্ভাবনা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং ধর্ম্মের ধর্ম্মত্ব বাঁচাইতে গেলে তাহা বিশুদ্ধ বিজ্ঞান হইলে চলে না—তাহার মধ্যে এমন একটি

নিত্যতার আদর্শ থাকা চাই যাহা সকল কালের তরঙ্গমালার ঊর্দ্ধে, উচ্ছ্রিতশির, ক্রমাগত কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় না। অর্থাৎ কেবলমাত্র যুক্তি তাহাকে ধারণা করিবার পক্ষে একান্ত নয়; কারণ যুক্তি বিশ্লেষণ করে মাত্র, সে সমগ্রকে দেখাইতে পারে না।

বিপদ শুধু ইহাই নয়—বিপদ আরও আছে। ধর্ম্মকে সমস্ত জীবনের অন্তরস্থিত শক্তিরূপে দেখিব, আধুনিক যুগের এই সংকল্প নিত্যকে অনিত্যের সঙ্গে এমনি জড়িত করিয়া দেয় যে অনেক সময় খণ্ডতা সমগ্রতার স্থান জুড়িয়া বসে, সংসারধর্ম্ম সর্ব্বোচ্চ পরমার্থ হয়। উইলিয়ম্ জেম্সের ভাষায় বলিতে গেলে তখন ঈশ্বর তাঁহার ভূমারূপ ত্যাগ করিয়া ধূলির মধ্যে নামিয়া আসেন—"God down in the dirt" —তিনি ব্যবহারগত সম্বন্ধেই Pragmatic ভাবেই ধরা দেন, তাঁহার অনন্তত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব মনকে আর বিস্ময়ে অভিভূত করে না। মুখে স্বীকার করি আর নাই করি, আধুনিক যুগে এদেশে এবং অন্য দেশের মধ্যে এই বৈষয়িক ভাব যথেষ্ট পরিমাণে ঢুকিয়াছে। ধর্ম্ম যে অনন্তকালের সত্য, ঈশ্বর যে ঈশানং ভূতভব্যস্য—ভূত এবং ভব্য উভয়ের ঈশ্বর —তাঁহার কাছে স্থানও নাই, কালও নাই, আছে সকল বাধাহীন অনন্ত,—সেই সত্যে সেই তাঁহাতে আত্মা পরম পরিশুদ্ধ হইয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই যে জীব মুক্ত হয়—এ কথা মনে করিয়া রাখা ও জীবনে উপলব্ধি করা বিশেষ কঠিন হয়।

অর্থাৎ ইউরোপে আমরা দেখিতেছি, ইতিহাসকে ধর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম হয় কঁতের পজিটিভিজম্—তখন মানবহিতৈষা করে আধ্যাত্মিকতার স্থান অধিকার। আর বিজ্ঞানকে ধর্ম্মের উপর প্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম হয় বৈষয়িক বা প্রাগ্ম্যাটিক্ ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত

অগণ্য অদ্বৈত প্রভৃতি কথাকে উপহাস করিয়া তাহার স্থানে বিচিত্র-তার অভিজ্ঞতাকেই প্রাধান্য দিতে চায়।

আধুনিক যুগে ইউরোপে তো এই কাণ্ডটিই ঘটিয়াছে, তাহা সত্যকে আর দেশকালের বাধা ছাড়াইয়া অনন্তের মধ্যে দেখিতে পাইতেছে না। আর যদিই বা দেখে তো অনন্ত এমনি বিচ্ছিন্ন সত্তা-মাত্রে পর্য্যবসিত হন যে, তাঁহাকে কেবলমাত্র একটা নাম ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। নিওহেগেলিয়ান তত্ত্বের এই নামমাত্রসার Absolute এর বিরুদ্ধে তাই উইলিয়ম্ জেম্‌স্ প্রভৃতির Pluralism অর্থাৎ বহুবাদ জাগিয়াছে। সকল গতির মধ্যে যে স্থিতি আছেন এবং স্থিতি আবার যে নিয়ত গতির মধ্যে আপনাকে আপনি প্রকাশ করি-তেছেন—অনন্তে সান্তে, নিত্যে অনিত্যে, ভাবে রূপে এই যে একটি সৃজনপ্রলয়ের লীলা যমকচ্ছন্দে নৃত্য করিতেছে—এ ভাবটিকে ইউরোপীয় ধ্যানী কোথাও আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। হইয়া উঠাটাই সেখানে বড়, কিন্তু হইয়া থাকাটা তেমন বড় নয়—ভাতি অস্তির চেয়ে সত্যতর—একের মধ্যে অন্যের বাসা যথেষ্ট এই নিগূঢ় প্রত্যয় সে দেশে ফোটে নাই। কেবল হয় তো অয়কেন প্রভৃতি দু-একজন মনীষীর বাণীতে ইহার কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়—কিন্তু আভাসের অতিরিক্ত কিছুই নহে।

সেই জন্যই বলিতেছি যে ধর্ম্মকে ঐতিহাসিক বা বৈজ্ঞানিক দিক্ হইতে আলোচনা করিতে গেলে ভারতবর্ষীয় মানুষকে ইতিহাসকে একটি বড় দিক্ হইতে দেখিতে হইবে। ইতিহাসের মধ্যে একটি নিত্য ও চিরন্তন আদর্শ যে বিদ্যমান থাকিয়া খণ্ডকালের মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশমান করিতেছে এ কথা ভারতবর্ষের লোকেরই বলা উচিত। যেমন ভারতবর্ষ স্বাজাত্যকে কেবল স্বারাজ্যের

পোলিটিক্যাল গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ বলিয়া জানিবেনা, জাতিবিশেষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও মহৎ ঐক্যরূপ যেখানেই দেখিবে সেখানেই যেমন স্বাজাত্য ফুটিয়া উঠিয়াছে এই কথা বলিবে,—তেমনি ইতিহাসকেও কেবল অসম্বদ্ধ ঘটনাপরম্পরা বলিয়া জানিবে না। ইতিহাস যে কেবলি এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় যাত্রা—খণ্ড খণ্ড বিচিত্রতার সমষ্টি—এবং তাহার যোগসূত্রও যে কেবল মাত্র বাহ্যিক, ভারতবর্ষই যদি ইতিহাসকে এমন করিয়া দেখে তবে ভারতবর্ষের পরম লজ্জার বিষয় হইবে। প্রত্যেক খণ্ড কালে প্রত্যেক খণ্ড অবস্থায় এমন কি কিছুই নাই যাহা স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া যায় না, যাহা কালকে ও অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া নিত্যতার মধ্যে স্থির হইয়া দাঁড়ায়? তাহা যদি সম্ভবপর নয় বলিয়া মনে করি, তবে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের কোন জীবন্ত যোগ নাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। তবে স্বাজাত্য বলিয়া একটা পদার্থ অতীব অলীক মায়া মাত্র, তবে ইতিহাস কেবল ক্ষণিক ছায়াবাজীর খেলা, তবে সত্য ঘড়ি ঘড়ি পরিবর্ত্তনশীল, এই কথাই বলা ভিন্ন আর উপায়ান্তর কোথায়? অথচ তাহা কি ঠিক্? অতীতের মধ্যে আমরা এমন অনেক জিনিস পাই যাহা বর্ত্তমানের চেয়েও বর্ত্তমান, বর্ত্তমানই যাহাকে পাইবার সাধনায় নিযুক্ত থাকে। সকল দেশের অতীতের ইতিহাসের মধ্যেই এইরূপ নিত্য সঞ্চয় অজস্র রহিয়াছে।

অতএব ইতিহাসকে সেই চিরন্তন একটি অভিপ্রায়ের ক্রমবিকাশ রূপে দেখিতে হইবে। সেই একটি নিত্য অভিপ্রায় সকল কালের অন্তরতম প্রদেশে বিদ্যমান, যিনি ঈশাণং ভূতভব্যস্য, সে অভিপ্রায় তাঁহারি—এ অধ্যাত্মদৃষ্টি যদি ভারতবর্ষের না হয় এবং এই দৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া ভারতবর্ষ যদি সমস্ত ইতিহাসের ভিতর হইতে ধর্ম্মের প্রকাশকে

এবং ধর্ম্মের বিচিত্র অভিব্যক্তিতে স্বাজাত্যের ক্রমপরিণাম লক্ষ্য না করে তবে আধুনিক কালে ভারতবর্ষের দেশহিতৈষা শূন্য ভাবুকতামাত্র হইয়া থাকিবে! তবেই তাহার ধর্ম্ম লইয়া তাহাকে হিমাচলশিখরে বসিয়া থাকিতে হইবে, জাতীয় জীবনের মধ্যে সে ধর্ম্ম প্রাণপরিপূর্ণ ধারায় নামিয়া আসিবে না। তবেই ভারতবর্ষকে কতকটা ভূমিখণ্ড ও বিচিত্র বিচ্ছিন্ন জাতির আবাসস্থান বলিয়া সমস্ত জগৎ পরিহাস করিতে থাকিবে।

ইতিহাসকে এমন বড় দৃষ্টিতে দেখিলে আমরা ধর্ম্মকে কি আর অতিপ্রাকৃত করিয়া দূরে রাখিতে পারি? এ কথা বলিতে পারি যে যাহা হইয়া গিযাছে তাহা নিঃশেষেই হইয়া গিয়াছে—সত্য একেবারে সেই কোন্ এক যুগে স্থির হইয়া চুকিয়া গিয়াছে?—বস্ আর কোন নূতন অনুসন্ধানের বিষয় নাই, জ্ঞানের ভাণ্ডারে একেবারে কুলুপ পড়িয়া গিয়াছে—এখন কেবল তাহাকে মূলধন করিয়া চিরকাল বসিয়া বসিয়া আমরা মহাজনী করিব? আর এই ভারতবর্ষে আমাদের ধর্ম্মাধিকারের একেবারে Permanent settlement— কারণ আমাদের ঋষিরা যেমন সত্যকে লাভ করিয়াছিলেন এমন আর কোথাও লাভ করা হয় নাই?—আমরা কি এই কথা বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া শাস্ত্রবাক্য ও চিরাগত প্রথার অনুসরণ করিয়া চলিব? এই প্রাণহীনতাকেই আধ্যাত্মিকতার চরম অবস্থা বলিয়া কীর্ত্তন করিব? পক্ষান্তরে এমন কথাও কি বলিতে পারি যে অনন্ত কি চিরন্তন কোথাও নাই—আছে কেবল বৈচিত্র্যপরম্পরা—কালের পরিবর্ত্তন মালা—ফেণ বুদ্বুদের দল? সুতরাং প্রাকৃত জগতের মত আধ্যাত্মিক জগতেও রূপ হইতে রূপান্তর, অবস্থা হইতে অবস্থান্তর সৃষ্ট হইয়া চলিয়াছে— কোনটাতেই শেষ নাই—আর এই অন্তহীন চলাটাই ধর্ম্ম? না;

আমাদিগকেই এই কথা বলিতে হইবে যে এক অভিপ্রায় এক নিয়ম এক সত্য আপনাকে যুগে যুগে জাতিতে জাতিতে নানার মধ্য দিয়া ক্রমাগত লইয়া চলিয়াছেন, কোন যুগ কোন এক জাতিই তাহাকে তাহার সমগ্রতায় জানে না, যদি চ সমগ্রতার আভাস তাহাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে বিরাজিত। কেবল যিনি ধ্যানযোগে সর্ব্বত্র প্রবেশ করেন, সর্ব্বমেবাবিশন্তি, তিনিই সেই আভাসকে দেখিতে পান্। তিনি জানেন যে বিশ্বমানবের বিরাট কলেবরে এই সকল জাতি তাহার বিচিত্র ইতিহাস লইয়া এক একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মত এক এক বিশেষ কার্য্য সাধন করিতেছে। কিন্তু সকলকে একত্র করিয়া, সেই এক মহাবিশ্বমানব এক 'far off divine event' এক সুদূর স্বর্গীয় পরিণামকে প্রত্যক্ষ করিবার মানসে ইতিহাসের এই বিরাট যাত্রায় যুগ হইতে যুগান্তর পর্য্যন্ত আলোকে অন্ধকারে উত্থানে পতনে জয়ে পরাজয়ে ছুটিয়া চলিয়াছে। তদেজতি, তন্নৈজতি—তিনি চলেন অথচ চলেন না—তিনি চলেন কালে, চলেন না সেই কালের অভ্যন্তরস্থিত নিগূঢ়গভীর অমোঘ অভিপ্রায়ে। সকল পরিবর্ত্তনকে সেই অপরিবর্ত্তনীয়ের ছায়ারূপে দর্শন করাই আমাদের দেশের ধর্ম্মসাধনার বিশেষত্ব।

ইতিহাসের মধ্যে এই নিত্যতার আদর্শটিকে দেখিবার কথা আমি যে এত করিয়া বলিতেছি তাহার কারণ আছে। আমরা যখন বলি যে ধর্ম্মকে স্বাজাত্যের ভিতর দিয়া পাইতে হইবে, তখন এই আপত্তি উঠে যে ধর্ম্ম তো দেশকালের অতীত সার্ব্বভৌমিক পদার্থ, কিন্তু স্বাজাত্য বস্তুটি তো সেরূপ নহে—অতএব যাহা সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন তাহাকে বিশেষ এক জাতির ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ধারার মধ্যে মিলাইতে যাওয়া কি সম্ভব হয়?

স্বাজাত্যের বোধ সঙ্কীর্ণ—ধর্ম্মবোধকে সেই সঙ্গে সঙ্কীর্ণ করি কি করিয়া?

কিন্তু আমি এতক্ষণ ধরিয়া যাহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আছি তাহা এই যে ধর্ম্ম যেমন দেশকালের অতীত তেমনি দেশকালের ভিতর দিয়াই তাহার প্রকাশ। এই সহজ কথাটি যাঁহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, তাঁহারাই ধর্ম্মকে জাতীয়তার ভূমি হইতে সরাইয়া তাহার প্রাণবধ করিয়া থাকেন। আত্মা তো দেশকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নন্—কিন্তু তাই বলিয়া আত্মার প্রকাশক এই দেহ কি তদ্রূপ? এই বিশেষের মধ্য দিয়াই নির্ব্বিশেষ আত্মা আপনাকে প্রকাশ করিতেছেন—এমনি কত কত বিশেষরূপ তাঁহাকে পরিগ্রহ করিতে হইবে তবে একদিন আত্মা আপনার স্বরূপ আপনি পাইবেন। তেমি এই বিশ্ব ঈশ্বরের প্রকাশ, কিন্তু ঈশ্বর কি নির্ব্বিকল্প নির্ব্বিশেষ নহেন?—অথচ তিনি যদি এই বিশ্বের নানাত্ব ও পরিবর্ত্তনমালার মধ্য দিয়া আপনাকে প্রকাশ না করেন তবে তিনি আছেন মাত্র এই কথা থাকে, তাঁহার প্রকাশ থাকে না। এই জন্য হেগেল বলিয়াছেন Becoming is the truth of Being —হইয়া-উঠাটাই হইয়া-থাকার সত্যতা। কোন কবির মধ্যে কবিত্ব আছে অথচ প্রকাশ নাই এ যেমন অসম্ভব কথা, তেমনি কিছু আছে অথচ প্রকাশের মধ্য দিয়া সে আপনার অস্তিত্বকে সার্থক করিতেছে না এ তেমনি অদ্ভুত কথা। ধর্ম্ম যদি বিশেষ কোন জাতির ঐতিহাসিক ধারাকে অবলম্বন করিয়া প্রকাশ না পান তবে ধর্ম্ম আছে মাত্র এ কথার কোন অর্থ থাকে কি? তাহা দেহবিচ্ছিন্ন দেহীর মত অত্যন্ত ভূতের মত একটা অ্যাবষ্ট্রাক্ট্ জিনিষ হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ ঐতিহাসিক ধারার ভিতর দিয়া ধর্ম্মকে দেখিতে গেলে পাছে তাহাকে খণ্ডকালের মধ্যে অবসিত করিয়া বসি, পাছে তাহার নিত্যদিকটি চাপা পড়িয়া যায়, এই জন্যই বলিলাম যে ইতিহাসকে ঘটনার জড়সমষ্টি করিয়া দেখা ভুল, তাহাকে একটি নিত্য ও চিরন্তন অভিপ্রায়ের ক্রমবিকাশরূপে দেখাই সঙ্গত। সেই নিত্য ও চিরন্তন অভিপ্রায়ের সূত্রে কালের সঙ্গে কাল, এক অবস্থার সঙ্গে অবস্থান্তর গ্রথিত হইয়া অচ্ছেদ্য অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত হইয়া এক বিরাটরূপ ধারণ করিতেছে—ভারতবর্ষে ইতিহাসের সেই বিরাট রূপ ধর্ম্মেরই রূপ। কখনো বা এই ইতিহাসে সেই অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে চেষ্টা হইয়াছে, আবার সেই সকল বাধা বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কোন যুগে তাহার একটি দিকের উৎকর্ষ কোন যুগে তাহার অন্য দিকের উৎকর্ষ—এমনি করিয়া ভাঙাগড়া জয়পরাজয়ের মধ্য দিয়া সেই ধারা চলিয়াছেই। এবং আজ যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেখানে একবার সমস্তটাকে বড় করিয়া দেখিবার একটা অন্তর্নিহিত প্রেরণা জাগিয়াছে। কারণ এখন সেই ধারা সকল বাধা ভেদ করিয়া অন্যান্য দেশের বৃহৎ ধারার সঙ্গে মিলিত হইবার উপক্রম করিতেছে।

বর্ত্তমান কালে আমরা এই সত্যটিকেই অত্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া ধর্ম্মকে প্রাণহীন করিয়া ফেলিয়াছি—দেশকালের মধ্য দিয়া ইতিহাসের মধ্য দিয়াই যে দেশকালাতীত ধর্ম্মের প্রকাশ হয়, এই সত্যটিকেই আমরা অস্বীকার করিয়াছি। আমরা মনে করিয়াছি ধর্ম্ম বুঝি জোড়াতাড়ার ব্যাপার—তাহা নানা বাগান হইতে অবচিত পুষ্পের একটি সুগ্রথিত মালা বা তোড়ার মত বুঝি। কিন্তু হায়, সেই তোড়ার সজীবতা যে দুদিনে ম্লান হইয়া

যায়! কিন্তু জাতীয় জীবনবৃক্ষে যুগে যুগে নব বসন্তের আবির্ভাবে যে পুষ্পোৎসব হয় তাহার তো এমন দুর্দ্দশা নয়। তখন কত কত মহাপুরুষ কত অজ্ঞাত অধ্যাত্ম সমুদ্র পাড়ি দিয়া সহসা কাননকে তাঁহাদের অজস্র কলসঙ্গীতে মুখরিত করিয়া দেন, উৎসব অবসানে সেই পুষ্প বীজগর্ভ হইয়া ফল ফলায়, তাহার অমৃত আস্বাদনে কত পান্থের ক্ষুধার শান্তি হয়, সেই ফলের বীজ আবার কত কত স্থানে নব নব বৃক্ষসম্ভাবনাকে প্রস্তুত করিতে থাকে। ধর্ম্ম যে এইরূপ একটি জীবন্ত জিনিস—সকল জীবনের সঙ্গে তাহার যে এমনিতর অঙ্গাঙ্গী যোগ—তাহা যে এখান হইতে ওখান হইতে সংগ্রহ করা তালি দেওয়া একটা জড়সমন্বয়মাত্র নয়—এ কথাটি ভাল করিয়া না উপলব্ধি করিবার জন্যই আমরা তাহাকে সেই সজীব দেশীয় প্রাণ-বৃক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়াছি। তাহাকে আমরা দেশকালের সঙ্গে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন এক অদ্ভুত সার্ব্বজনীন আকাশকুসুম করিয়া তুলিয়াছি। আর এইজন্যই অধুনা তাহা আমাদের সকল প্রয়াসকে এমন তুষার-রুদ্ধ প্রবাহের মত করিয়াছে, ক্রমাগত সকল কাজের মধ্যে চিন্তার মধ্যে একটি হিমশীতল মৃত্যুর স্পর্শ অনুভূত হইতেছে।

বুঝি অন্য দেশের যাহা শ্রেষ্ঠ জিনিষ তাহাকে নিজের বিশেষ দেশীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া লইতে হইবে, তাহাকে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিতে হইবে, নহিলে যাহা বাহিরের জিনিস তাহা বাহিরেই থাকিয়া যাইবে। শিল্প বল, সাহিত্য বল, সমাজব্যবস্থা বল, ধর্ম্ম বল কিছুই কোনদিন অনুকরণের উপর প্রাণ পায় নাই—যতক্ষণ না তাহারা দেশের চিরন্তন প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া ফুটিবার চেষ্টা করে ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাহারা ক্রমাগত ব্যর্থ হইতে

থাকে। বাহির হইতে যাহা কিছু লইব তাহা আপনার করিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইব, তাহাকে স্বকীয় প্রকৃতির ছাঁচে ফেলিয়া লইব, তাহাকে আপনার ইতিহাসের চিরন্তন অভিপ্রায়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইব, এককথায় তাহাকে দেশীয় করিয়া লইব,—ভবিষ্যতে এই দিকে না চলিলে জগতের কোন মহাজাতিরই পরিত্রাণ নাই।

এইদিক্ দিয়া যখন আমরা আমাদের দেশের আধুনিক কালের ধর্ম্মান্দোলনের ইতিহাসকেও পাঠ করিয়া দেখিব, তখন দেখিব যে মাঝে মাঝে যতই কেন আমরা স্বাজাত্যের তটবন্ধন অস্বীকার করিয়া বিশ্বপ্রসার লাভ করিবার চেষ্টাকে আশ্রয় করি না, আমাদের দেশের আধুনিককালে যে মনীষিগণ এই যুগের নিত্যবাণীকে সকল সাময়িক কলকোলাহলের ঊর্দ্ধে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই তাঁহাদের অধ্যাত্ম প্রবাহকে স্বাজাত্যের তটবন্ধন হইতে বিচ্যুত করিয়া স্রোতো-হীন সঙ্গীতহীন পূর্ব্বাপরবিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি ও প্রসার দান করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনোৎসবের শুভ মুহূর্ত্তে এদেশে যে মহাপুরুষ শঙ্খধ্বনি করিয়া তাহার প্রথম পৌরোহিত্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই যুগগুরু মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্মকে কত বড় বিশ্বমানবক্ষেত্রে প্রসারিত করিয়া দেখিয়াও কোনদিন তাহার দেশীয় স্বরূপটিকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান সভ্যতার ধর্ম্মতত্ত্ব, সমাজনীতি, আইন প্রভৃতি সকল বিভাগের জ্ঞানলাভ করিয়া যেমন তাহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন, তেমনিই যে গভীরতর মূলে তাহারা এক এবং ভেদরহিত সেই অখণ্ড ঐক্যভূমিটিকেও তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার দেশের বেদান্তশাস্ত্রই তাঁহাকে সেই মূলজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, যাহার উপর দাঁড়াইয়া তিনি সকল সভ্যতার

নিজ নিজ বিশিষ্ট ধারা এবং যে মহাসমুদ্রে সকল ধারার অবসান এই উভয়ই একই সময়ে তাঁহার ধ্যানদৃষ্টিযোগে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই জন্যই সেই মহাপুরুষ শেষ পর্য্যন্ত আপনার ধর্ম্মকে প্রাচীন ঋষি-উপদিষ্ট ধর্ম্ম বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং আপনাকেও কোন স্বতন্ত্র নামের দ্বারা সংজ্ঞিত না করিয়া শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু বলিয়াই প্রচার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। অথচ আজ আমরা যে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়া রব তুলিয়াছি, আমরা কি কেহই রামমোহন রায়ের মত কোন ধর্ম্মেরই ঐতিহাসিক অভিব্যক্তিকে এবং সেই দিক্ দিয়া আলোচনা করিয়া কোন ধর্ম্মেরই নিত্যস্বরূপকে দেখিবার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াসী হইয়াছি? শুধু ধর্ম্ম কেন—সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, আইন প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি যেমন গভীর ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন,—ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার ইতিহাসে ইহারা কি ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং কি কারণে ইহাদের মধ্যে নানা বৈচিত্র্য ঘটিয়াছে—যেমন করিয়া তিনি তাহার আলোচনা করিয়াছিলেন, আমরা কি কেহই ততবড় এক বিরাট ক্ষেত্রে আপনাদের চিত্তকে উন্মুক্ত করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও যত্ন করিয়াছি? খৃষ্টধর্ম্মের আধুনিক আন্দোলনের উদ্যোগীগণমধ্যে একজন প্রধান ছিলেন রামমোহন রায়। অথচ তাই বলিয়া তিনি কোন দিন আপনাকে খৃষ্টান বলিতে রাজি হন্ নাই। তিনি নিজ জাতীয় ভূমিতে দাঁড়াইয়া সেই অধ্যাত্ম চক্রনাভিটিকে অধিকার করিয়াছিলেন যেখান হইতে নানা ধর্ম্মের নানা অরসমূহ চক্রনেমির দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহা সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজ দেশীয় প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সেই অতলমূলে পৌঁছিয়াছিলেন যেখান হইতে কত শাখা-

প্রশাখা কতদিকেই বাহুবিস্তার করিয়া দিতেছে—অথচ এই সকল ভিন্নতা ভিন্নপন্থী হওয়া সত্ত্বেও মূলত এক—ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন বাধাই তাঁহার হয় নাই! হিন্দু হিন্দু থাকিয়া খৃষ্টান খৃষ্টান থাকিয়া মুসলমান মুসলমান থাকিয়া সেই পরমভূমিতে উপনীত হইতেছে যেখানে সকল পথের শেষ গম্যস্থান, সেই রসসমুদ্রে নিপতিত হইতেছে, যেখানে সকল ঋজুকুটিলধারার শেষ গতি। রামমোহন রায়ের এই পরিপূর্ণ উদার দৃষ্টির কথাই মার্কিণ কবি হুইটম্যান তাঁহার "ভারতযাত্রা" নামক কাব্যে গাহিয়াছেন:—

Lo soul! see'st thou not God's purpose from the first?
The earth to be spanned' connected by network,
The races, neighbours, to marry and be given in marriage
The oceans to be crossed, the distant brought near
The lands to be welded together,—

হে আত্মা! তুমি কি প্রথম হইতেই ঈশ্বরের পরম অভিপ্রায়কে দেখিতে পাইতেছ না? সমস্ত পৃথিবীকে যে বাষ্পীয়যানের সাহায্যে পরিমাণ করা হইবে এবং বৈদ্যুতভারে বাঁধা হইবে, ভিন্ন ভিন্ন জাতিগণ প্রতিবেশীগণ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সমুদ্র উত্তীর্ণ হইবে, দূর নিকট হইবে এবং দেশগুলি দৃঢ়বন্ধনে সংযুক্ত হইবে?—অথচ কেহ কাহারও স্বাতন্ত্র্যকে বিলোপ করিবে না। এই তো রামমোহনের দৃষ্টি।

রামমোহনের পর যে মহাপুরুষের এদেশে আসিলেন সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিক দিক্ এবং দেশীয় দিক্ উভয়কে সম্মিলিতরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি অতীতকালের

উপনিষদের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে তাঁহার অধ্যাত্ম জীবনের পরিপুষ্টি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি উপনিষদের কালের যে সকল সাময়িক মত ও সংস্কার নিত্যকালের মধ্যে স্থান পাইবার মত নয়—তাহাদিগকেও মাথায় তুলিয়া আপনার জীবনকে ভারাক্রান্ত হইতে দেন নাই। যে অতীত বর্ত্তমানে বাঁচিয়া আছে বা বাঁচিতে পারে সেই অতীতকেই তিনি টানিয়া আনিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রাণধারার মধ্যে মধ্যে যে সকল কালের আবর্জ্জনাস্তূপ যে সকল মূঢ় সংস্কারভার জমা হইয়া তাহার স্রোতকে রুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে, তিনি সবলে সে সকলকে সরাইয়া দিয়াছেন। এই কথাটি না বুঝিলেই বলিতে হয় যে তিনি শাস্ত্রকে উড়াইয়া কেবল নিজের স্বানুভূতিকেই বড় করিয়াছেন, তিনি এদেশের ধর্ম্মের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির ভাল করিয়া পরিচয় পান নাই,—যেমন কেহ কেহ তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন। আমি এই প্রবন্ধে কেবলি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি যে ইতিহাসকে নিত্যের দিক হইতে না দেখিলে, তাহার অন্তরে একটি চিরকালীন আদর্শকে না ধরিতে পারিলে, ধর্ম্মকে হয় অতিপ্রাকৃত করিয়া একটা পরিসমাপ্ত পদার্থের মত করিয়া রাখিতে হয় এবং ইতিহাসকে অস্বীকার করিতে হয়, নয় তাহাকে প্রাকৃত জিনিষের মত একটা পরিবর্ত্তনপরম্পরা বলিয়া সকল নিত্যতার ভাবকে উড়াইয়া দিতে হয়। মহর্ষি প্রাচীনকালের মধ্যে ধর্ম্মের যে শাশ্বত একটি বাণী আছে তাহাকে নিজের জীবনে সত্য করিয়া প্রাচীনে নবীনে ভেদ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন,—এই কথাটি বলিলেই তাঁহার সম্বন্ধে কোনপ্রকার অন্যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অপবাদ আমাদের আরোপ করিতেও লজ্জাবোধ হইবে। বলা বাহুল্য ইতিহাসকে নিত্যতায়

দেখা পণ্ডিতের কর্ম্ম নয়, তাহা রামমোহন রায় ও মহর্ষির ন্যায় মহা-পুরুষেরই কর্ম্ম—পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম জেম্‌সের মত বিচিত্রতাকেই দেখে, পরিবর্ত্তনের তরঙ্গমালাই গণনা করে।—তা ছাড়া কোন্‌টা নিত্য, কোন্‌টা অনিত্য, কোন্‌টা কালের আবর্জ্জনা কোন্‌টা চিরকালীন সত্য—এ নির্ণয়ও পণ্ডিত বা সমালোচকের দ্বারা সম্ভাবনীয় নহে, একমাত্র সত্য ধর্ম্মজীবনই ইহা নির্ণয় করিতে সমর্থ। সেইজন্য ধর্ম্মকে ঐতিহাসিক দিক দিয়া আলোচনা করিয়া দেশের চিরন্তন প্রাণের সঙ্গে সংযোগ সাধন কি করিয়া করা যাইবে, তাহা দেখিতে গেলে, ইতিহাসের অন্তরস্থিত সেই শাশ্বতবাণী যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছেন ও উচ্চারণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইতে হইবে।

আজ এই সভার এই শুভ অধিবেশনে এইখানেই আমার এই অসম্পূর্ণ প্রবন্ধের উপসংহার করি। এই কথা বলিয়া শেষ করি যে সার্ব্বভৌমিকতা আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু দেশের সঙ্গে যোগযুক্ত হইয়াই সেই লক্ষ্যের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর হইবে। ধর্ম্ম স্বরূপতঃ সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু দেশের ইতিহাসের মধ্য দিয়া তাহার বিশেষ প্রকাশ বলিয়া ধর্ম্ম ক্রমাগতই নানা অবস্থার মধ্য দিয়া নিজস্বরূপকে উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই ইতিহাস হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে তাহাকে অত্যন্ত ভুল করিয়া দেখা হইবে—তাহার সকল গতি রুদ্ধ হইয়া যাইবে, তাহা প্রাণহীন হইয়া পড়িবে। তখনই সার্ব্বভৌমিকতা হইবে সাম্প্রদায়িক মতের গোঁড়ামি অথবা নিশ্চেষ্ট জড়ত্বময় সমদৃষ্টি। একদল তাহাকে দেশকাল হইতে ছাড়াইয়া অত্যন্ত জীবনহীন মত মাত্র করিয়া দেখিবে যাহা ক্রমেই সকল বিকাশকে বাধা দিয়া সুতীব্র

ও ভয়াবহ একদেশদর্শিতা হইয়া উঠিবে—অন্যদল কিছুমাত্র সত্যাসত্য নির্ণয় না করিয়া নিত্যে ও অনিত্যে ক্ষুদ্রে ও মহতে তাল পাকাইয়া তেমনিই পাষাণভারের মত তাহাকে করিয়া তুলিবে এবং বলিতে থাকিবে যে সবই অনাদিকাল হইতে হইয়া বইয়া চুকিয়া আছে, আমাদের কেবল চুপ করিয়া মানিয়া যাওয়া ছাড়া আর কিছুই করিবার নাই। একদল ধর্ম্মকে দেশীয় জীবন-বৃক্ষ হইতে ছিনাইয়া লইয়া শুষ্ক করিয়া ফেলিবে, অন্যদল তাহার উপর এত জীর্ণতার ভার চাপাইতে থাকিবে যে তাহাতেও তাহার প্রাণবাঁচা দায় হইয়া উঠে। কিন্তু যে অতীত হইতে প্রবাহিত প্রাণধারায় মৃত আবর্জ্জনার ভারকে একেবারে ভাসাইয়া লইয়া যায়, যাহা এক বিরাট অভিপ্রায়ের আলোকে সকল যুগেরই সাধনাকে তাহার নিত্যমূর্ত্তিকে উদ্ভাসিত করিয়া দেখায়, এবং সেইজন্য যাহার মধ্যে গতি ও স্থিতির এক অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য ঘটে, পুরাতন কেবলি নূতন নূতনতর হইয়া উঠে—সেই এক পতিতপাবনী মৃতসঞ্জীবনী ধর্ম্মের ধারা ভিন্ন আমাদের এ মরুময় শুষ্কতা দূর হইবার আর আশা নাই। আমাদের ধর্ম্মজীবনের সেই-খানেই গতি। সেইখানে পৌঁছিবামাত্র আমাদের সকল চেষ্টা, সকল কর্ম্ম, আমাদের গৃহসমাজের সকল অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা, শিল্প সাহিত্যের প্রসার—সমস্তই একটি নবপ্রাণ লাভ করিবে। আমরা আমরা হইব—এবং নিজেদের সেই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের পথ দিয়া বিশ্বমানবের পরম ঐক্যভূমিতে উপস্থিত হইব—মোহান্ধ সংস্কার সকল ছিন্ন হইয়া যাইবে, বিশ্বমানব-বিধাতার বিরাট অভিপ্রায় আমাদের এই দেশের দ্বারা সুসিদ্ধ হইবে।

সম্পূর্ণ।